চিরন্তনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাইমা পাবলিকেসন্‌স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তারাশঙ্করের গল্প-সংগ্রহ 'চিরন্তনী' প্রকাশিত হল। এ প্রকাশের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। আজকের দিনে উপহারে বইয়ের সমাদর বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান উপহারের চেয়ে কম নয়। মূল্যবান মহার্ঘ অন্যান্য উপহারের চেয়ে আঙ্কিক মূল্যে তার দাম অনেক কম হলেও মর্য্যাদায় তার দাম সমানই। অথচ উপহার হিসেবে এমন অনেক বই দেওয়া হয় যা রুচি এবং সজ্জায় দৃষ্টিকে পীড়িত করে। বিশেষ করে সেই উদ্দেশ্যেই তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ থেকে কতকগুলি বিশেষ রসের গল্প বেছে এই সংকলন সজ্জিত করে দেওয়া হল।

প্রকাশক—

গল্প ক্রম : রাণুর বিবাহ, তাসের ঘর, বড় বৌ, প্রতিমা, প্রত্যাবর্তন, শিলাসন, তমসা, জায়া ।

রাণুর বিবাহ

নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রাণু! রাণুর বিবাহ। বাপ ষাট টাকা বেতনে স্কুলে মাস্টারী করেন। মেজকাকা উকিল, ছোটকাকা ডেপুটি। উপার্জনের দিক হইতে আয়ের সমষ্টি অল্প নয়, কিন্তু সংসারটি বৃহৎ। সংসারে তিন ভাইয়ের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা উনিশ; এ ছাড়া এক ভাগিনেয়ীর এক ছেলে, এক ভাগিনেয়ের এক পুত্রও এই সংসারে থাকিয়া পড়াশুনা করে। ইহার পূর্বে চার ভাগিনেয় এখানে থাকিয়া পড়াশুনা শেষ করিয়াছে, এখন অন্যত্র কাজকর্ম করিতেছে। একজন উকিল, দুইজন ডাক্তার। চার-পাঁচ ভাগিনেয়ীর বিবাহও এই বাড়ি হইতে হইয়াছে। মোটকথা, ধনসমাগমের পথ সুগম হইলেও নির্গমনের পথ ততোধিক সরল ও সুগম বলিয়া হাঁটুবলে উপরের দিকে তো কখনও উঠিল না, বরং দিন দিন নীচের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে।

রাণু মেয়েটি সুন্দরী নয়, তবে সুশ্রী। ভাগ্যও তাহার ভালই বলিতে হইবে যে, পাত্রপক্ষ নিতান্ত অল্পেই প্রসন্ন মনে কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইয়া গেল। পাত্রটিও ভাল, সরকারী চাকুরে, সদ্য সদ্য পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরীতে ভর্তি হইয়াছে। বয়স তেইশ-চব্বিশ, দেখিতেও শ্রীমান।

রাণুর বাপ ভোলানাথবাবু কথাবার্তা পাকা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভোলানাথবাবু সরাসরি অন্দরে গিয়া মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন—আপনার আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে গেল মা।

মা তরকারী কুটিতেছিলেন, তরকারী কোটা ফেলিয়া দিয়া দুইটি হাত অর্ধোত্তোলিত করিয়া যেন দারুণ দুশ্চিন্তাটাকে চিরতরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাক্ বাবা, বাঁচলাম! বৌমা, বৌমা, অ বড়-বৌমা, শুনছ, রাণুর বিয়ে আজ পাকা হয়ে গেল।

রাণুর মা ও খুড়ী অদূরে ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মা আবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—দেখ্ তো রে, সুকুমারী কোথায় গেল? ডাক্ তাকে। ভবানী, সুরো, এদের ডাক্।

সুকুমারী ভোলানাথবাবুর মাসীমা, ভবানী বিধবা ভগ্নী; সুরমা বিধবা ভাগ্নী, ভোলানাথবাবুর অপর এক ভগ্নীর কন্যা।

ভবানী পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—এই যে আমি।

সুরোও এই ঘরে রয়েছে। আমি শুনেছি, সুরো হয় তো শুনতে পায় নি। সুরো, অ সুরো!

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, যেন মাটির প্রতিমার মত মেয়ে সুরমা। সে আপন অভ্যাস মত আসিয়া দাঁড়াইল, চোখে মুখে কোন ঔৎসুক্য নাই, দৃষ্টিতে কোনও প্রশ্ন নাই, নিতান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সে আসিয়া শুধু যেন কোনও আদেশ প্রতিপালনের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

ভোলানাথবাবুর মা ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—সুরো শুনেছিস, রাণুর বিয়ের কথা আজ পাকা হয়ে গেল।

সুরমা কানে ভাল শুনিতে পায় না।

সে অতি মৃদু একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে শুনিয়াছে, অথবা বেশ, বেশ!

—কে রে, সর্, কে রে? সর্, সর্, এ্যাডা কাপড়ে ছুঁসনে। আঃ, তুই আবার হাঁ করে দাঁড়ালি কেন?

ইতিমধ্যে কখন ছেলেরা আসিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের পিছন হইতে ভোলানাথবাবুর মাসীমা হাঁকিতেছিলেন— সর্, সর্!

যে ছেলেটা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া ভোলানাথবাবু বলিলেন—সরে এস না বিভূতি, শুনতে পাচ্ছ না, তোমায় সরে যেতে বলছেন!

পথ মুক্ত পাইয়া মাসীমা হাতের ঘটীটা হইতে গোবরজল-ছড়া দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, দিদি?

উত্তর দিলেন ভোলানাথবাবু—হ্যাঁ মাসীমা, সব ঠিক হয়ে গেল; দিনও ঠিক হয়ে গেল। আসছে মাসের ৪ঠা আর ১২ই, মানে পাত্র যেদিন ছুটি পায়।

—লগ্নপত্র করেছ তো বাবা?

ভোলানাথবাবু বলিলেন—সে আবার কি মাসীমা?

ঐ তো বাবা, তোমরা সব সায়েব হয়ে সব ভুলে গেলে। লগ্নপত্র হবে, তার মাথায় সিঁদুর দেওয়া হবে, দুই পক্ষ তাতেই সই করবে···

রমানাথবাবু বলিলেন—Marriage contract বোধ হয়।

মাসীমা বলিলেন—ওই তো বাবা, বিয়ে সুদ্ধ তোমরা ইংরেজী করে ফেললে! আর তোমাদেরই বা কি দোষ দেব বল, মেয়েদের হাল দেখে যে অবাক হই গো। বিয়ের পাকা কথার খবর এল, আর বাড়ির এয়োরা হাঁ

করে দাঁড়িয়ে, দেখ না! সব মেমসায়েব হয়ে পড়েছে, শাঁখ বাজাতে ভুলে গেছে, উলু দিতে লজ্জা করে…

এতক্ষণে মা বলিয়া উঠিলেন—ও মা, তাই তো, শাঁখ বাজাও বৌমা, উলু দাও সব। কি হলে গো তোমরা, ছি ছি ছি!

বাড়ির এয়োরা এতক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিল; একজন তাড়াতাড়ি শাঁখ আনিতে ছুটিল।

ভোলানাথবাবুর বড় মেয়ে চিনু খুঁজিতেছিল রাণুকে; এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়া সে বোধকরি সমবেত সকলকেই প্রশ্ন করিল—রাণু কই গো, রাণু কই? রাণু, রাণু!

মাসীমা বলিলেন—এই, রাণু রাণু করে পাগল হয়ে উঠলেন একেবারে! যত সব মেমসাহেবী ঢং দেখলে গা জ্বালা করে আমার। আরে, আগে শুভকাজ মঙ্গল-আচারগুলো সেরে ফেল! তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে বাড়িখানা মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাসীমা এতক্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া গোবরজল-ছড়া দিয়া আপনার নির্দিষ্ট ঘরখানিতে যাইতে যাইতে বলিলেন—এই তো! সংসার-ধর্মকে দিও সকলের উঁচু আসন, আচার-ভ্রষ্ট হলে কি হিঁদুর সংসার টেঁকে?

বাহিরের ঘরে ছেলেদের মধ্যে বড়দের তখন জটলা বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ভোলানাথবাবুর মেজ ছেলে গোপাল খবরটা লইয়া আসিল।

বড় ভাই গোবিন্দ বেকার, সে তখন ছোট একটা আয়না দেখিয়া কেশ-প্রসাধনের নূতন একটা ভঙ্গী আবিষ্কারের গবেষণায় নিমগ্ন ছিল। রমানাথবাবুর বড় ছেলে সুধাংশু নিতান্ত অকারণে গভর্ণরের কাছে একটা দরখাস্তের খসড়া লিখিতেছিল; ভোলানাথবাবুর ভাগ্নের ছেলে শ্যামল গোপনে রচনা করিতেছিল একটা কবিতা। ভগ্নী ভবানীর দৌহিত্র রমেন অঙ্কের খাতায় একটা পাঁচতলা বাড়ির নক্‌সা লইয়া চিন্তায় বিভোর।

গোপাল যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিয়া ফেলিল—রাণুর বিয়ে পাকা হয়ে গেল, দাদা!

গোবিন্দ আয়নাখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল—Finally settled তো?

সুধাংশু দরখাস্তখানা ফেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—কবে?

শ্যামল প্রশ্ন করিল—সেই শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গেই তো?

রমেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন খুঁজিয়া না

পাইয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষায় নীরব হইয়া রহিল।

গোপাল উত্তর দিল—একেবারে final হয়ে গেল আজ। দিন ঠিক হয়েছে দুটো, একটা ৪ঠা আর একটা ১২ই, যেদিন শ্রীকুমারবাবুর ছুটি পাওয়ার সুবিধে হবে আর কি! পুলিসের চাকরি তো, এঁ্যা?

বাড়ির ভিতরে তখন মায়ের চারিধারে ঘন হইয়া বসিয়া পরামর্শ-সভা চলিতেছে। মা বলিতেছিলেন—সময় থাকতে চিঠি দেওয়াই ভাল, তাদেরও সব ঘর-সংসার গুছিয়ে আসতে হবে তো। ননী নিশ্চয় আসবে, মাণকে নিয়েই ভাবনা, তার আবার নানা ঝঞ্ঝাট। শিবানী তো আসবেই, সমরও আসবে। হ্যাঁ, সমরের বৌ আছে বাড়িতে, সেখানেও একটা চিঠি দাও।

মা এবার নীরব হইলেন।

কথা হইতেছিল মায়ের মেয়েদের আসিবার। ভোলানাথবাবুর সাত বোন। ভবানী অবসর পাইয়া বলিল—শ্যামাও আসবে ভুলু, আমি তাকে আগেই লিখেছি। জামাইও পাঠিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এখন তোমরা জামাইকে একটা চিঠি দাও।

শ্যামা ভবানীর কন্যা।

ভোলানাথবাবু ওদিকের উঠানের কোণে একটি ছেলের কান্নায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আঃ, রঙীনটা কাঁদছে কেন? ওরে রাণু, দেখ না বেরিয়ে। আমি বারবার রাণুকে বলি, ওরে ছেলেদের দিকে একটু নজর রাখিস্ তুই। এঁ্যা, এ কি, দেখি দেখি! টিঞ্চার আইডিন! টিঞ্চার আইডিন!

চিবুকটা কাটিয়া রক্তে সমস্ত বুকটা রক্তাক্ত করিয়া রঙীন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজভাই রমানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—বেঞ্জইন দিয়ে সীল করে দিন! বেঞ্জইন, টিন্‌চার-বেঞ্জইনের শিশিটা কোথায় গেল? বলিয়া তিনি হাঁকিতে আরম্ভ করিলেন—গোপাল, গোপাল, সুধাংশু!

গোবিন্দ তখন বলিতেছিল—দেখ, পাঁচজন বাইরের ভদ্রলোক আসবেন, তাদের সামনে···অথচ বাবা হয়ত বলবেন, ওই জামাতেই হবে। ওইটে কি একটা জামা! পাঁচ বছরের পুরোন হয়ে গেল। অন্তত একটা ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি, ডীপ চকলেট কি গ্রে রঙের, আর একজোড়া জুতো।

সুধাংশু বলিল—আমি তো একটা সার্জের কোট নেব, নেভি-ব্লু কালার বেশ ডিসেণ্ট!

গোপালের বেশী সখ একটা পুলওভারের, সে বলিল—আমার একটা পুলওভার হলেই হবে। কমে হবে, এ সময় খরচ বেশী করা তো ঠিক নয়, এ্যাঁ?

শ্যামল বলিল—একটা প্রীতি-উপহার কিন্তু খুব ভাল চাই!

রমেন ভাবিতেছিল, চুলটা আজ আর না কাটিয়া সেই সময়েই কাটিবে, সেই ভাল হইবে।

রাণু তখন সদ্যঃস্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, মুখে তাহার অতি মৃদু মধুর একটি হাস্যরেখা। পুরাতন সোজা সিঁথিটা মুছিয়া দিয়া তাহার সখ হইল বাঁকা সিঁথি টানিবার! চিরুনিটা দিয়া পিছনের দিকে চুলের রাশি সামান্য ঠেলিয়া পুরাতন সিঁথিটি মুছিয়া বাঁ দিকে সবে সিঁথিটা টানিয়াছে, এমন সময় রক্তাক্ত রঙীনকে কোলে করিয়া ভোলানাথবাবু ঘরে ঢুকিয়া রাণুকে দেখিয়া বলিলেন— এই যে,ও, চুল আঁচড়ানো হচ্ছে! কিন্তু এ রকম বিলাসিতা তো ভাল নয়। চুল আঁচড়াইতে যদি তোমার দু ঘণ্টা যায়···

ওপাশ হইতে রমানাথবাবু বলিয়া উঠিলেন—Up-to-date হচ্ছেন। Most Ludicrous!

ভোলানাথবাবুর মা-ও উঠিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন—আমাদের তখন বিয়ের কথা হলে, সে যেন একটা দারুণ লজ্জার কথা হত। আমরা কারও সামনে বেরুতাম না।

গোবরজল-ছড়া দিতে দিতে মাসীমা কোথায় যাইতেছিলেন; ঘরের মধ্যে জটলা দেখিয়া তিনি উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—রাম-রাম-রাম, ও কি সিঁথি হয়েছে, মাগো! ধিঙ্গী মেয়ের ফিরিঙ্গী হতে সাধ হয়েছে বুঝি বিয়ের কথা শুনে? মুছে ফেল, বলছি ও বিচ্ছিরী সিঁথি!

রাণু পাংশুমুখে রোরুদ্যমান রঙীনকে কোলে লইয়া সেখান হইতে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

দিন কয়েক পরে। অগ্রহায়ণের ৬ই তারিখ। ৪ঠা তারিখে পাত্রের ছুটি পাওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া ১২ই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।

ভোলানাথবাবু কয়খানা চিঠি হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন—মা, শিবানী-দিদি তো কাল আসছেন। ননী-দিদি লিখেছেন, সম্ভব হলে বিয়ের আগের দিন

এসে পৌঁছবেন। মণি-দিদি আসতে পারবেন না। হ্যাঁ, শিবানী-দিদির সঙ্গে ওঁর ছোট মেয়ে প্রতিমা আসছে। আর তিনি লিখেছেন, অণিমাকে আনবার জন্যে যেন আজই কাউকে পাঠানো হয়! অণিমা অনেক দিন আসেনি। জামাই পাঠাতে রাজী হয়েছেন।

অণিমা শিবানীর মেজ মেয়ে।

মা বলিলেন—তা হলে গোবিন্দকে পাঠিয়ে দাও আজই। আর সমর, বিমল আসছে কবে?

সমর শিবানীর পুত্র, ডাক্তার। বিমলও অন্য এক দৌহিত্র, সেও ডাক্তার।

—সমর বিয়ের আগের দিন আসবে, আবার বিয়ের পরদিনই চলে যাবে। ডাক্তার মানুষ। বিমল আরও এক দিন আগেই আসবে; তবে, সে লিখেছে আপনার যে, সে এসে শ্বশুরবাড়িতেই উঠতে চায়, কারণ এখানে তো লোকজনের ভিড় হবে, তার নানারকমের অসুবিধে। আমি তো বলি মা, এ খুব ভাল প্রস্তাব! কি বলেন?

মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—বেশ, তাই লিখে দাও।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামা কোন পত্র দেয়নি ভুলু?

তাড়াতাড়ি একখানা পত্র বাহির করিয়া ভবানীর হাতে দিয়া বলিলেন—এই যে। শ্যামা আসবে তিন দিনের জন্যে, এই যে চিঠি দিয়েছে।

গোবরজল-ছড়া দিতে দিতে সুকুমারী কোথায় যাইতে যাইতে দাঁড়াইয় বলিলেন—ও বাবা ভুলু, বিয়ের বাজার করতে যখন যাবে, আমার জন্যে একপ্রস্থ কোষাকুষী এনো, মানিক। তোমার মেয়ের বিয়ে, মাসীকে ওটা তোমায় বিদেয় দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি ভোলানাথ বলিলেন—বেশ তো মাসীমা, বেশ তো।

—হ্যাঁ বাবা, বেশ একটু ভারী দেখে, আর গড়নটা যেন ভাল হয়, ঠিক যেন কলার মোচার ধরণের।

মা বলিলেন—হ্যাঁ ভুলু, গোপাল সুধাংশু বড্ড ধরেছে আমাকে, একটা প্রীতি উপহার···

—না-না মা, অনর্থক বাজে খরচ করে কি হবে বলুন! ও আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। আমি ওদের 'না' বলে দিয়েছি।

—আমিও বলেছিলাম, হবে না, কিন্তু ওরা আমার নামে কবিতাটা লিখে এনেছে।

বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তারপর আবার বলিলেন—বেশ লিখেছে রে, শুনবি তুই ? কি, দাঁড়া—'কত গরু-খোঁজ করে পেয়েছি তোমারে ছেড়ে তো দিব না আর হে।'—এমনি ঠাটা করে লিখেছে ! তা দু-তিন টাকা খরচ তো। যখন এত হবে তখন ওদের সাধটাও মিটুক।

সুকুমারী বলিলেন —আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই বাবা, তবে মনে থাকে যেন, বেশ একটু ভারী দেখে আর এই কলার মোচার মত ঢংয়ের।

তিনি চলিয়া গেলেন।

ভবানী বলিল—ভুল্, রমেনের একটাও জামা নেই যে ভদ্দর-লোকের সামনে বেরোয়, ওর একটা জামা···

ভোলানাথবাবু বলিলেন—বাইরে দর্জি এসে মাপ নিচ্ছে দিদি, রমেনের মাপ নিয়ে নিয়েছে।

বাহিরে তখন রমানাথবাবু বসিয়া ছেলেদের জামার মাপ দেওয়াইতে ছিলেন। গোবিন্দের পাঞ্জাবি, সুধাংশুর নেভি-ব্লু রংয়ের সার্জের কোট, রমেনের গরম কাপড়ের কোটের মাপ দেওয়া হইয়া গেল। গোপালের পুলওভার এ-বেলাতেই আসিবে। সে টাকার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

রাণুর বড় বোন চিনু মাকে গিয়া বলিল— মা, রাণুর বড় ইচ্ছে যে, ওকে একটা ফার-কোট কিনে দেওয়া হয়। ওর ভারি সাধ।

রাণুর মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওঁকে বলতে ভয় করছে, মা। কিছু বললেই একেবারে যেন মারতে আসছেন।

চিনু বলিল—ওর ওটা বড় সাধ, মা !

রাণুর মা চুপ করিয়া রহিলেন।

ওদিক হইতে ভোলানাথবাবু চিৎকার করিতেছিলেন—না-না তোমাকে যেতে হবে না, দাও-দাও, আমাকে দাও, আমি নিজেই যাব।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল গোপালকে লইয়া। সে পুলওভারের মূল্যের অপেক্ষায় ছিল, এমন সময় ভোলানাথবাবু আদেশ করিলেন—চিঠি ক'খানা ডাকে দিয়ে এস তো !

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া গোপাল দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলানাথবাবু বলিলেন—যাও।

—পুলওভারের টাকাটা পেলে, বাজার হয়ে···

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথবাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন—দাও-দাও, চিঠি ফিরিয়ে

দাও আমাকে, আমি নিজে যাব।

গোপাল দৃঢ় মুষ্টিতে চিঠি কয়খানা ধরিয়া কহিল—না।

ভোলানাথবাবু চিঠি কয়খানা সজোরে তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—না-না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি নিজে যাব, দাও দাও। চিঠি কয়খানা লইয়া তিনি ঘরে আসিয়া ডাকিলেন—বড়-বৌ, বড়-বৌ!

রাণুর মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া বক্তব্যের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। ভোলানাথবাবু বলিলেন—দাও তো তোমার কাছে যে চল্লিশ টাকা আছে, সেটা দাও তো!

রাণুর মা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি করবে?

—আঃ, যাই করি না, গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসব না, দাও!

—না, সে টাকায় আমি রাণুর একটা আংটি আর ঝুমকো গড়িয়ে দেব। হাঁ, আর রাণুর বড় সাধ, একটা ফার-কোট…

— ফার-কোট! বিস্ময়ে ভোলানাথবাবুর চোখ দুইটি বড় হইয়া উঠিল।

রাণুর মা আশঙ্কায় চুপ করিয়াই রহিল, কোন উত্তর দিল না, কথার ফুৎকারের অভাবে ভোলানাথবাবু আর জ্বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, ধুমায়মান অবস্থাতেই বলিলেন—ফার-কোট পরে করো। আর ঝুমকো আংটি থাক্, ও তো চুক্তির মধ্যে নয়। এখন টাকাটা আমাকে দাও।

—রাণুর বড় সাধ…! অসহায়ভাবে রাণুর মা অসমাপ্ত কথাগুলি বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—সাধ তার অনেক কিছু হতে পারে, জড়োয়া গহনা, মুক্তার মালা, হীরের মুকুট, পান্নার দুল, কিন্তু সে আমার দেবার সাধ্য নাই।

ওদিকে বাহিরে রাণুকে লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। স্নানের ঘরের দরজায় সুকুমারী ঠাকুরাণী মিনিট দশেক অপেক্ষা করিয়া ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিলেন—কে ঘরে রয়েছে, কে? এতক্ষণেও স্নান হয় না? কে রয়েছিস্?

রাণু সাধ করিয়া একখানা লাক্স-সাবান মাখিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি কোনরূপে স্নান সমাপ্ত করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই সুকুমারী বলিলেন—ও মা, যাব কোথায় আমি! এত সাবান মাখার ধুম! ছি ছি ছি! এই ঠাণ্ডা, আর এতক্ষণ ধরে সাবান মেখে স্নান!

ভবানী রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, এ যে মুখচোখ এর

মধ্যেই রাঙা হয়ে উঠেছে।

সত্যাই অধিক সাবান ঘষার ফলে রাণুর মুখের ফর্সা রঙ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথবাবু ঘরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—দেখ, তুমি অত্যন্ত···থাক্। এখন ওকে কুইনিন খাইয়ে দিন একটা! আর এক কাজ করুন, ছেলেদের একজোড়া মোজা দেখে দিন তো, মোজা পায়ে কারও একজোড়া স্যাণ্ডেল নিয়ে চলাফেরা করুক; তাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয়টা একটু কমবে। বলিয়া নিজের ঘর খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিলেন একটা কালো ও একটা লাল রঙের মোজা।

রাণু মোজা জোড়াটা হাতে করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার এই বিসদৃশ পোশাক পরিতে চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল। রমানাথবাবু পুনরায় আদেশ করিলেন—পরে ফেল।

এবার রাণু কহিল—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না।

—ঠাণ্ডা লাগবে না! রমানাথবাবু রুদ্ধ বিস্ময়ে রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ কারণটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—I see, তোমার লেডিজ সিল্ক মোজা না হলে পছন্দ হচ্ছে না! তারপর ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দিদি, বলুন ওর বাপকে, মেয়েকে লেডিজ সিল্ক স্টকিং কিনে দিতে, নইলে ওর পছন্দ হচ্ছে না।

রাণু সভয়ে ত্রস্তভাবে মোজা দুইটি টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পায়ে পরিয়া ফেলিল। পরিয়াও কিন্তু রাণুর চোখ ফাটিয়া জল আসিল—সে নত মাথা আরও খানিকটা নত করিল, চোখের জল মাটিতে পড়িয়া মুহূর্তে শুষিয়া গেল।

ভোলানাথবাবুর মা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—রমানাথ, টেকো দিয়ে সুতো কেটে দিতে হবে যে, বাবা!

সুকুমারী স্নানের ঘর হইতেই হাঁকিয়া বলিলেন—ও-দিদি, কলসীতে আলপনা দেবে কখন, আজই তো দেবার কথা।

মা উত্তর দিলেন—এই বসল বোধ হয় সব। ও-মা উলু দিতে বল, শাঁখ বাজাতে বল

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই শাঁখের শব্দের সঙ্গে উলুধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাণু ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া ছাদের এক-কোণে নিরালায় বসিয়া ভাল করিয়া কাঁদিয়া লইল। সমস্ত সংসারের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের দিন! ভোলানাথবাবুর ও রমানাথবাবুর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। আত্মীয়-স্বজনে ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমর আসিয়াছে, বিমল আসিয়াছে; প্রতিমা, অণিমা, শ্যামা তাহারাও সবেমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছে। শিবানী এবং আর এক বোন আসিয়াছে।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রী তার খাটাইতেছিল। ভোলানাথবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিলেন—সমর কোথায় গেল, সমর?

কে বলিল—তিনি মোটরের কি পার্টস চাই তা কেনবার জন্য গেছেন।

— বিমল, তাহলে তুমি একবার স্টেশনে যাও না বাবা—

বিমল মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—আর কেউ গেলে হয় না? আমি একটু হারটার ক্লিপটা এঁটে আনতে যাচ্ছি।

—অ, তাহলে দেখি, গোবিন্দ কোথায়?

গোবিন্দ তখন অণিমা, প্রতিমা ও সমরের ছেলেমেয়েদের জামার মাপ দেওয়াইতেছিল। অণিমার ছেলের প্রতিমার ছেলের মত স্যুট হইবে, প্রতিমার মেয়েদের অণিমার মেয়েদের মত জামা হইবে। সমরের মেয়ের একটা জামা হইবে।

গোবিন্দ বলিতেছিল—দেখুন ফ্রক-স্ট্যাইট হবে, তবে গলাটা হবে অনিমাদির মেয়ের, মানে, এই জামাটার মত রাউণ্ড শেপ; আর এর হাতটা আছে হাফ, এই হাতটা হবে প্রতিমাদির মেয়ের মত ফুল-হাতা। তবে কাঁধের কাছটা একটু ফুলো থাকবে।

ভোলানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—তুমি করছ কি?

—প্রতিমাদি অণিমাদি···

—আঃ, গোপাল কোথায়?

—সে গেছে দোকানে; শ্যামাদির জন্যে, মেজবৌদির কাপড় দেখিয়ে একখানা কাপড় আনতে।

গত্যন্তর না দেখিয়া ভোলানাথবাবু নিজেই ছুটিলেন স্টেশনে।

ঘরের মধ্যে রাণু বধূবেশে তখনও মাকে বলিতেছিল---আমায় একটা ফার-কোট কিনে দিলে না মা!

রাণুর মা এবার বিরক্ত হইয়া বলিল---দিয়ে-থুয়ে কখনও তো মেয়ের মন পাওয়া যায় না সংসারে!

— কই কই? ও-বাড়ির দিদি ঘরে ঢুকিলেন একরাশ জিনিস লইয়া।

রাণুর মা একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিল---ওরে, ডাক্ তো সব, ঠাকুমাকে, খুড়ীমাকে, সকলকে। বল্, দিদি কত জিনিস দিয়েছেন, দেখবেন আসুন।

দেখিতে দেখিতে ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

বিবাহ হইয়া গেল।

বাসরে কলরব উঠিতেছিল। রাণু ছিল নীরবে বসিয়া। দাদি ঐ মোটা শরীর লইয়া শুধু গান নয়, নাচও আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বাঃ প্রতিমাদিদির মুক্তার কলারটা কি সুন্দর মানাইয়াছে, বেনারসীখানাও কি সুন্দর! অণিমাদিদি হাতে বোধ হয় বারোগাছা করিয়া চুড়ি পরিয়াছেন, আলোর ছটায় ভাল করিয়া চাওয়া যায় না। রাণু আপন হাতের কয়গাছি মিন্‌মিনে চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে কি যেন ভাবে। তাহার মনের আনন্দ উদাস হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা-বিদায়ের সময় রাণু কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কনকাঞ্জলি দিতে দিতে রাণুর মুখের পানে চাহিয়া ভোলানাথবাবু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাণু-মা! রাণুর চোখেও জল আসিল। সে অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, শুধু বাবা নয়, ঠাকুমা কাঁদিতেছেন, ওই যে, মাও কাঁদিতেছেন, প্রতিমাদি, অণিমাদি, শ্যামাদি সবার চোখে জল! কাকাও কাঁদিতেছেন! ওই যে সুকুমারী-ঠাকুমার চোখেও জল! তাহার জন্য, শুধু তাহারই জন্য কাঁদিয়া সারা! এমন মুহূর্ত রাণুর জীবনে কোনদিন আসে নাই, তৃপ্তিতে গৌরবে তাহার বুক ভরিয়া গেল; ফার-কোটের দুঃখ, আভরণের অভাবের সমস্ত বেদনা ঘুচিয়া গিয়াছে; সে মুহূর্তে সত্যসত্যই রাজরাণীর মত মহিমময়ী, বন্দনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সকলকে ছাড়িয়া সে আজ পর হইতে চলিয়াছে। যে বেদনা তাহার মনের মধ্যে একটি বিন্দুর মত টলমল করিতেছিল, সেই বেদনা অকস্মাৎ যেন সমুদ্রের মত বিশাল হইয়া উঠিল; চোখের জলে তাহার চন্দনচর্চিত মুখ ভাসিয়া গেল।

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ-পেয়ালা, চা-দানি ইত্যাদি রং-চং-করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়,—চার টাকা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের কোরো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন ; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে !

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী !

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান সিল্‌ভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল ? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমার দোষ দিও না যেন !

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না !

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল, সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ ! তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়তো কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না।—পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা—বউমা !

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন ?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়িদের না ডোমেদের ?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। কেন, কী হল ?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ওটা আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কী আর বলব বল !

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে, অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ও পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও, তোমাদের দেশের মতো খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরেই মাছের পুর দোব তো মা ?

অ্যাঁ, মাছের পুর ? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না !

ময়দার ঠোঙার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিং দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিং ভিন্ন কোন জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিং আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না ; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বলিলেন, পশ্চিম ভালো জায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে-সব জিনিস পাওয়া যায় ?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিং পাওয়া যায় না, মা। কাবুলীরা সে-সব

নিজেদের জন্যে আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকা-কড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে-জিনিস দেয়। শুধু কি হিং, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিং—এ সব ছোট ছোট ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি! মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলেকয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাতকাটা—এতটুকু; তামাক না, বিড়ি না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে!

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক শিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া সে আবার বলিল, আমার মা কক্ষণো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যেময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও; সেরে নিয়ে চুলটুল বেঁধে ফেল গে।

কেশ প্রসাধন অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ, রং বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকে দিতাম। আমার আর কী রং দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনেদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রং কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপ ফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়ে ফরসা রং?

হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওঁরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মতো বউ হয়েছে তোমার দিদি! লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল; তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কী যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না! আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব; বিয়ের পর আমি ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনরা সব ভালো করে পড়েছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাত শো টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নেই।

কোথায় তোমার বাপের বাড়ি ?

এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন।

কী রকম পান-টান ?

আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজ ভাই বলেন মাঝে মাঝে, এ রকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টোঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈত্রিক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি। গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসেবে সন্ন্যাসী !

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু মিষ্ট হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী এবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তা হলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা ?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন্ কথায় কে যে আঘাত পায় সে বোঝা, বোধ করি, বিধাতারও সাধ্য নয়! তোমাদের চেয়ে বড় ঘর—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের ওই কিন্তু তত্ত্বতল্লাসও দেখি না। আজ দু বছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই !

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন ! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম সে আবার আমি কেন 'আমার' বলে আমার ঘরে আনব ! তবে যাকে দান করলাম—সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কী বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন্ কালে ?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা ; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, একশো পঞ্চাশ আশি—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না ?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়তো বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই ? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তার আয়তন, সংকীর্ণ তার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন ; তাই মাসে দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপ করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরণ করিয়া থাকে, মনের আগুনও নিভিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিশে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা,

বার বার সংকল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোন কথা লিখিতে পারে নাই—কোন অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে, তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মতো নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলির সহিত।

এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দোব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশাই? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়লেন—এই—ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে, হ্যান, দিতে হবে।

নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা—কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

দেখ না, লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশ টাকা মেরে একজন পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান!

মাও বোধ করি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে আর তোমার চিন্তা কী বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝিলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যেই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশো পঞ্চাশ আশি, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন্ হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কী করিবে, কী বলিবে, কোন নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শৈল বিহ্বলের মতো বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মতো দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল। মা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল— হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে স্বেচ্ছাচার। তাই ঐটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরুদণ্ড হইয়া গেল, সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদে রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, একি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কী করব, বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা! তার ওপর হেমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেনে, সঙ্গে কে এসেছে শৈল, জামাই?

শৈল বিবর্ণমুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

কই সে, ওমা বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ

তো বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো! বল, মা ডাকছেন। শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল! কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন এখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই, কেউ তো নেই!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে—সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফিরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা! সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে কার একটা চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখীন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল. এই সকালে দাদা, ভালো আছেন আপনি?

হ্যাঁ। তা বেশ, কই তুই নতুন লোক, খাস বাংলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব!

তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে?

আমাদেরই পুকুরে খুব বড বড় মাছ,—আধমন, পনেরো সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। —জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বলল, বউদিকে কুটতে হবে! ওরে বাপরে, সে

যা আমার ভয়! এখন আর ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিস সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস—তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছে, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরেই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেয় না, সংবাদ লন না! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ!

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি, শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্য তিনি সাধুপ্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখিলেন—

আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন কখনও বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না সেখানে কী ঘটিয়াছে, শৈল কী অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই আপনার কোন আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোন পত্র দেয় না! দয়া করিয়া কী ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—

অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজ ছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি-এ-তে সে যোগ্য স্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চোখে জল আসিল।

মনে তাঁহার যে ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে, সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মতো মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয় পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন—কলিকাতায় বাড়ি, ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—

বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়েনি। এগুলো মাঝলা জাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল,এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল আর কারও হয় না! রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এ সব কী বল তো? 'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল আনা একটা পুকুর নেই, অথচ—ছিঃ! আর 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে! আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া' —ওকি—ওকি, কাঁদছ কেন শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সেকথা যে তাহার অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়।

পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা হইলে কি হয়, সে কালেও বটে, একালেও বটে, বংশের ধারাকে অতিক্রম করিলেই লোকে কহে—প্রহ্লাদ।

সেতাব আর মহাতাপ, দু ভাইকেও লোকে কহিত—জোড়া-প্রহ্লাদ।

সরকার-গোষ্ঠী বনিয়াদী বংশ, পুরুষানুক্রমিক জমিদার, মস্ত নাম-ডাক, প্রবল প্রতাপ।

সেতাবের পিতামহ দুর্দান্ত উগ্রক্ষত্রিয়-প্রধান একটা মৌজা খরিদ করায় বন্ধুবান্ধব হিতৈষী পাঁচজনে বলিয়াছিল—বাবু, মহালটা কেনা কি ভাল হল? ও মহাল নিলামে নিলামেই ফিরছে, যে কিনেছে সে ঘর থেকে কিছু দিয়ে তবে ছেড়েছে।

বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—জানো?...

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম
কংসদমন কৃষ্ণচন্দ্র আগুরীদমন হাম।

কথাটা বলা তাঁহার মিথ্যা হয় নাই; মহালখানা তিনি শাসন করিয়াছিলেন। সে মহাল এখন আর সরকারদের নাই, তবে কথাটা আজও আছে।

শুধু প্রবল প্রতাপই নয়, দয়াল দাতা বলিয়াও চাকলাটায় সরকারদের বিপুল খ্যাতি ছিল। গণিয়া দান কখনও সরকারদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, মুঠায় যাহা উঠিয়াছে তাহাই দান করিয়াছে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে অতিথি আসিলেও কখনও বিমুখ হয় নাই; প্রত্যহ খিচুড়ির আয়োজন পাকশালায় মজুত রাখিয়া ভাণ্ডারী পাচকের ছুটি হইত। গৃহহীনের গৃহের জন্য সরকারদের বিশাল তালপুকুর ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কড়া হুকুম ছিল, অরন্ধনে কাহারও দিন যাইবে না; অভাব হইলে ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইবে। প্রত্যহ একজন পাইক গ্রাম ঘুরিয়া দেখিত কার বাড়িতে ধোঁয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৈফিয়ৎ তলব হইত, কেন তার বাড়িতে উনান জ্বলে নাই? সঙ্গত কারণের অভাবে তাহার শাস্তি হইত, সাহায্য মিলিত, শেষে আবার বাবুর নিজ নামে খরচ লিখিয়া জরিমানার টাকা বাজে আদায়ের ঘরে জমা হইত।

উৎসব-আড়ম্বর তাও অক্লান্ত অবিরাম ধারায় চলিত। পালে-পার্বণে সে তো রীতিমত বরাদ্দই ছিল, তাহার উপর এলাকায় যাত্রা, খেমটা, কবি, ঝুমুর যে কোন দল আসিলে সরকার-বাড়িতে গান না শুনাইয়া চলিয়া যাইবার হুকুম

কাহারও ছিল না। একবার একদল ভাল খেমটা পঁচিশ দিন বাবুদের বাড়িতে আটক ছিল; শেষে বাড়ির গিন্নী যুদ্ধ ঘোষণা করায় তবে তারা ছুটি পায়। এদিকে বাবুদের বাগানবাড়ির প্রতি ছোট তালগাছের খেড়োর ভিত ।কটি করিয়া গাঁজার কলিকা থাকিত, গিরিমামার খাতা কখনও তিন শূন্য হয় নাই। গিরিমামা হইতেছেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার, বাবুদের দৌলতে জমি-পুকুর তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু বাকী কম পড়ে নাই।

সেই বংশের পিণ্ডদাতা সেতাব শুধু পূর্বপুরুষগণকেই পিণ্ড দিল না, তাহাদের চালচলন ধারাধরণ সমস্তকেই পিণ্ড দান করিল। গিরিমামার দেনা বাড়া তো দূরের কথা, বিনা পয়সাতেই তিনশূন্য হইল; সে স্পষ্ট বলিয়া দিল, টাকা নাও তো সম্পত্তি ফিরে দাও, সম্পত্তি নাও তো খাতায় উশুল দাও; যদি চালাকি কর, টাকা তো দেবই না, সম্পত্তিও কেড়ে নেব।

ছোট ভাই মহাতাপের গাঁজা ভিন্ন চলে না বটে, কিন্তু সে এক-পয়সা নগদ বিদায়। গিরিমামা আর সরকারবাবুদের নাম খাতায় ছুকিতে পায় না। প্রজার ঘাড়ে সমানে যাত্রার জন্য বৃত্তি আদায় চলিল বটে, কিন্তু খাতায় খরচ বন্ধ হইয়া গেল। যাত্রা-খেমটা তো দূরের কথা, বাবুদের দুয়ারে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর খঞ্জনীবাদ্যও নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এস, হরি বল, ভিক্ষে মাগ; গীতবাদ্য কিসের?

দান-খয়রাৎ ও সব তো নিছক বরবাদ, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। মুঠি তো মুঠি, আঙ্গুলের আগাতেও একটা পয়সা উঠিত না; লোকে খায় না খায়, তাহাতে কাহার কি যায় আসে?

একটা বড় কথা বলিতে ভুলিয়াছি, সরকার-বংশের সব চেয়ে মহৎ খ্যাতি ছিল—সত্যবাদিতার। একবার মিথ্যা এজাহার দিবার ভয়ে একটা সম্পত্তিই তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেতাব কিন্তু সে পথই মাড়াইল না, সে স্বার্থের জন্য দিনকে রাত্রি বলিতেও দ্বিধাবোধ করিত না, আর সে পারিতও। লোকে বলে, সেতাব নাকি ঘুমন্ত লোকের হাতের টিপ লইয়া আসিয়া খৎ তৈয়ারী করে। জালেও তাহার অরুচি নাই।

ক্রমে লোকে বলিতে আরম্ভ করিল—হাড়ে পাশা হয় বাবা, চামড়ায় ডুগডুগি, গোটা দেশের ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়বে না।

ছোট প্রহ্লাদ মহাতাপ, সে ছিল পাগল, পুরাতন বাগানে তাহার বাসা, নিয়মিত গাঁজা আর সের দুই দুধ, এই হইলেই হইল: সংসার খুব সুখের স্থান,

কোথাও কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই!

তাহার অভাবও বড় হইত না, কারণ শীর্ণদেহ সেতাব মহাতাপের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিত; ওই দেহ আর কাণ্ডজ্ঞানহীনের ক্রোধ, ও তো সভ্য ভাবে ঝগড়া করিবে না, হয়তো তুলিয়া আছাড় মারিয়াই বসিবে।

তবে ভরসার মধ্যে পত্নী কাদু, তাহার কথা মহাতাপের বেদবাক্য। কাদু আর মহাতাপ একবয়সী, বাল্যসাথী ন' বছরের কাদু যখন এ বাড়িতে আসে, মহাতাপ তখন আট বছরের। কাদু নিশ্চয়ই স্বামীর লাঞ্ছনা দেখিতে পারিবে না।

২

বন্ধুর জীবনপথে সংসারটি গোলাকার পৃথিবীর মতই বেশ গড়াইয়া গড়াইয়াই চলিতেছিল, মাঝে মাঝে ছোট-বৌ মানদার ফোঁসফোঁসানি অসন্তোষের উপল-খণ্ডের মত পথরোধ করিলেও গতিরোধ হইত না, একটু-আধটু ঝাঁকানি মাত্র বোধ হইত।

ছোট বধূটির সংসারজ্ঞান খুব টনটনে। ভাগাভাগির ঘরের মেয়ে সে, ভাগটা খুব বুঝিত, কিন্তু খোদ ভাগী না। বুঝিলে পরের বুঝিয়া লাভ কি?

রাত্রিতে আরক্ত নেত্রে মহাতাপ যখন শিবনাম করিতে করিতে বিছানায় এলাইয়া পড়িত, তখন মানদার ফোঁসফোঁসানি বাড়িয়া যাইত, সে বেশ গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করিত—বলি, কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখ কিছু?

মহাতাপ চমকিয়া লাল চক্ষু যথাসম্ভব মেলিয়া কহিত—কি, বড় বৌ খায় নি বুঝি কিছু?

মানদার আর কথা সরিত না, ক্রোধে লজ্জায় একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকিত।

মহাতাপ কহিত—কার সঙ্গে ঝগড়া হল, তোমার সঙ্গে বুঝি?

মানদা নীরব। মহাতাপ অসহিষ্ণু হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিত—বলি, কথা কও না যে?

মহাতাপের বিরাশী সিক্কা ওজনের কিলকে মানদার বড় ভয়; সে এবার উত্তর দেয়, কিন্তু ঝাঁজ যায় না—আমার কি সাধ্যি? রাণীর সঙ্গে কাট-কুড়ানীর ঝগড়া করবার সাধ্যি কি?

—তবে দাদার সঙ্গে বুঝি···

অতি তীব্র ঝঙ্কার দিয়া মানদা এবার কহিল—জানি না আমি!

মহাতাপ অতি রোষে উঠিয়া বসে—আজ চামারের নেতার মেরে দেব একেবারে, বৌটাকে মেরে ফেলবে কোনদিন।

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহাকে ধরিয়া বলে—লোকে যে তোমাকে পাগল বলে তা মিথ্যে নয়।

মহাতাপও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া বলে—কেন?

মানদা বলে—নইলে তুমি বড় ভায়ের নেতার মারতেই বা যাবে কেন, বড়-বৌরাণী উপোস করতেই বা যাবে কেন, তাদের ঝগড়াই বা হবে কেন?

বিছানার উপর মহাতাপ বসিয়া বলে—তবে তুমি বলচ কি? হলই বা কি?

মানদার কান্না পায়, সে কহে—বলি, তুমিও তো বিষয়ের অর্ধেক মালিক, তা দানপত্র তোমার নামে হয় না কেন, তোমার দাদার নামেই বা হয় কেন? আর বিষয়ে···

মহাতাপ এই পর্যন্ত শুনিয়া আর শোনে না, পরম নিশ্চিন্তের মত বিছানায় শুইয়া বলে—শিব! শিব! এতক্ষণ ব্যার-ব্যার করে শেষ হল কিনা—বিষয়!

মানদাও আর শুনিতে পারে না, সে হড়াম করিয়া দরজাটা খুলিয়া বারান্দায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়—বোধ হয় কাঁদে।

ঘরে মহাতাপ শুইয়া গান ধরে—

মন বল রে শিব শিব
বিষয় বিষ তার নাম করো না।

বোধ হয়, মানদাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেই চেষ্টা করে।

৩

সরকারবাড়ির সংসারের মধ্যে দুটি বৌ, আর ছোট ভাই-এর এক ছেলে বছর দেড়েকের। বড়-বৌ কাদুর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সারা দেহে বন্ধ্যানারীর একটা সতেজ স্বাস্থ্য ও লাবণ্য। শুধু তাই নয়, গ্রামে বড়-বৌ'র একটা রূপের খ্যাতিও আছে। সে এ ঘরে আসিয়াছিল ন'বছর বয়সে। ছোট বৌ আসিয়াছিল আরও কম বয়সে, সরকারবাড়িতে ন'বছরের বেশী বয়সের বৌ আসা নিষেধ। মানদা একটু মোটাসোটা, গোলগাল দেহ, তাই মহাতাপ তাহাকে বলিত ধুমসী, আর তাহার পিঠে কিল মারিতে মহাতাপের বড় মজা

লাগিত,—কারণে অকারণে; কারণেরও বড় অভাব হইত না। মহাতাপ তাহাকে দেখিতে পারিত না, তাহার ঐ ধুমসী গতরের জন্য। ধুমসীও মহাতাপের হিংসা ছাড়া থাকিত না, ঠিক ছোট বড় ভাই-বোনের মত। শুধু মহাতাপের নয়, বড়-বৌ'র হিংসাতেও সে জর্জর। তার একটা কারণও ছিল। সে কারণ হইতেছে বড়-বৌ আর তার ছোট দেওরটার পরস্পরের নিবিড়তা। বড়-বৌ'র জ্বালাতে খেলাঘরে কখনও মানদা মহাতাপের বৌ সাজিতে পায় নাই। আজও তাই, মহাতাপের ও বড়-বৌ'র নিবিড় বন্ধন যেন আরও নিবিড়—কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত পরামর্শ। মহাতাপের উঠিতে বড়-বৌ, বসিতে বড়-বৌ, বড়-বৌ যে[illegible]—তাহার জপের মালা, ইষ্টকবচ; আর মানদা যেন কাঠ-কুড়ানী, প[illegible]টক, তাহার কান যেন মহাতাপের কটু কথা শুনিতে, তাহার পিঠ যেন বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল খাইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সেতাবেরও এটা ভাল লাগে না,—না লাগিবারই কথা, সৌন্দর্যের ধনে দেউলিয়া সে। সুস্থ সবল পুরুষত্বভরা মহাতাপের সঙ্গে সুন্দরী বড়-বৌ'র পরম নিবিড় ভাব তাহার সহ্য হয় না। সকল জিনিসেরই একটা সীমা আছে, এ যে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাহিরের পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাহার মনও তাহাতে সায় দেয়, কিন্তু এ যে ঘরের কেলেঙ্কারি, আর তেজস্বিনী বড়-বৌ'র জবাবগুলিতেও যেন ক্ষুরের ধার, বলিতেও কিছু সাহস হয় না।

তবু সে কখনও কখনও বলে—জান, সব জিনিসেরই মাত্রা আছে, সবই হিসেব করেও···

বড়-বৌ বলে—পাটোয়ারী জালিয়াতি বুদ্ধিতে এ হিসেব করা যায় না, বুঝলে? তুমি অতি ইতর, অতি অধম।

একেবারে 'প্রথম ভাগে' নামাইয়া তাহাকে অচল করিয়া দেয়, সেতাবের আর বাক্য সরে না, অগত্যা সে 'ধারাপাতে' সরিয়া পড়ে। সদরে গিয়া সুদ কষে। সে হিসাবও তাহার ভুল হইয়া যায়। অন্দর হইতে বড়-বৌ'র খিল্ খিল্ হাসি, মহাতাপের উচ্চ হাস্য, আর মানদার অসন্তোষভরা ঝঙ্কারে তাহার সব গোলমাল হইয়া যায়। সে হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ভাবে, ভিন্ন হওয়াই ভাল। কিন্তু এতবড় বিষয়, তাঁহার বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়, এ বিষয় সে বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহাই দুই ভাগ হইবে! তার চেয়ে ওরা যা করে তাই ভাল। আক্রোশটা পড়ে গিয়ে ষোল আনা ওই বড়-বৌ'র উপর। সে আপন মনেই ভাবে, তার চেয়ে দুষ্টা নারী ত্যাগ করাই ভাল।

কত সময় মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াও যায়—বিয়ে করব ফের, দুষ্টা ভার্য্যা···

কিন্তু তাও করা যায় না। ছোট এতটুকু একটা চারাগাছ টানিলে তলার মাটি ফাটিয়া যায়, তা দীর্ঘ ষোল বছর ধরিয়া যে বুকের মাঝে আছে, তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া তো সোজা নয়; বড়-বৌ আসিয়াছে ন'বছরেরটি, আর আজ তার বয়স পঁচিশ।

সেতাব উন্মাদ হইয়া উঠে।

তাহার সময়ে সময়ে ইচ্ছা করে, ঘরে আগুন দিয়া, বড়-বৌ আর মহাতাপকে খুন করিয়া পলাইয়া যায়।

এ ভারতে নারীর অধিকার লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র ঘটিয়া গিয়াছে, সরকারগোষ্ঠী তো তাসের ঘর!

সেদিন মহাতাপের ছাতু খাইতে সাধ হইয়াছিল।

সকালেই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় বড়-বৌকে হুকুল হইল—বৌ, আজ ছাতু খেতে হবে ভাই, নোতুন গুড় দিয়ে ছাতু না হলে···

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল—না হলে মেরে ছাতু করে দেবে?

মারধোরের কথাটা জমিয়া উঠিল। মহাতাপের লাগিল ভাল, সে বসিয়া প্রবল উৎসাহে কহিল—মাইরি বলচি বৌ, মনে হয় এক-একবার দিই ওই ধুমসো গতর ভেঙে, ছাতু মাখার মত চটকে দিতে ইচ্ছে করে—একটি ছাড়া গাঁজার পয়সা আর মেলবার জো নেই!

ছোট-বৌ মানদা ও-ঘরে যাইতে যাইতে কুট কাটিয়া যায়—এর পর আর তাও জুটবে না, চোক থাকতে কাণার ওই হয়।

ওই এক কথাতেই আগুন ধরিয়া যায়, মহাতাপ ডাক ছাড়িয়া লাফ দিয়া ওঠে, কি বল্লি, আমি কাণা? ধুমসীর নেতার আজ···

বড়-বৌ হাতের কাজ ফেলিয়া চট্ করিয়া মহাতাপকে ধরিয়া বলে—ছিঃ, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা কি, বস, বস···

ছোট-বৌ কিন্তু থামে না, বড়-বৌ'র করুণায় তাহার বাঁচিতে সাধ হয় না। সে ঝঙ্কার দিয়া বলে—না-না, বসবে কেন, দাও না তোমার পোষা কুকুর ছেড়ে···

দুর্দান্ত মহাতাপ বড়-বৌ'র হাত ছাড়াইয়া গিয়া মানদার ঘাড় চাপিয়া

ধরে, বড়-বৌও পিছন পিছন গিয়া মহাতাপকে কহে—ছাড়ো বলচি. ছাড়ো·

কণ্ঠে বেশ প্রভুত্বের স্বর। সে প্রভুত্ব খর্ব হয় না। মহাতাপ মানদার ঘাড় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসে, যেন জাদুকরীর মায়ামুগ্ধ হিংস্র পশু ; কিন্তু শাসাইয়া আসে—আচ্ছা, থাক্ তুই, তোকে বিদেয় আমি করবই, তোর সঙ্গে ঘর করা আমার পোষাবে না।

বড়-বৌ মানদাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া আসিয়া বলে—কি বল তুমি তার ঠিক নেই, ছেলের মা, বিদেয় করবে কি !

মহাতাপ বলে—দেখো তুমি, সে আমি ঠিক করে রেখেচি !

বড়-বৌ বলে—কি করবে শুনি ?

মহাতাপ খুব বিজ্ঞভাবে একগা[illegible]সিয়া বলে—সে বলচি না আমি, সে আমার মনেই আছে।

বড়-বৌ হাসিয়া বলে—আমাকে বলবে না ভাই ?

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া হাসে, বলে—না, সে দেখো তুমি, আমি তাক্ লাগিয়ে দেব।

বড়-বৌ বলে—ভাল ভাগ্যি আমার, তুমি যে মনের কথা মনে রাখতে শিখেচ, এও আমার ভাগ্যি !

মহাতাপ বলে—বৌ, আজ ভাই আমাকে আট আনা পয়সা দিতে হবে।

বড়-বৌ বলে—আমি মেয়েমানুষ, পয়সা কোথা পাব ভাই ?

মহাতাপ সবিস্ময়ে কহে—তুমি বাড়ির লক্ষ্মী, তোমার পয়সা নেই বৌ !

বড়-বৌ হাসিয়া কহে—মেয়েমানুষ, পয়সা কোথা পাবে বল, তোমরা দেবে তবে তো ; তোমার দাদা···

মহাতাপ পরম বিরক্তিভরে বলে—রাম রাম, সক্কাল বেলা চামারের কথা ছাড়ান দাও তো।

বড়-বৌ বলে—তাই তো বলচি, তাকে তো জান, সে কি !

মহাতাপ বলে—এত খাতির কিসের বল তো, চামার বলচ না যে, সে—তাকে, ইঃ যেন গুরুঠাকুর !

বড়-বৌ হাসিয়া বলে—তাই না হয় বল্লাম, সে তো একটা পয়সাও কখনও দেয় না, আর তোমার তো···

মহাতাপ জাগ্রত হইয়া বলে—দাঁড়াও, এবার আমি মহালে যাব, নিশ্চয় যাব, পালকি চেপে।

বড়-বৌ বলে—সে সুবুদ্ধি হলে যে আমি বাঁচি, খেয়ে মেখে বাঁচি, গাছের আমড়া দেখে ভাত খেতে হয় না!

মহাতাপ বড়-বৌ'র মুখপানে তাকাইয়া থাকে।

বড়-বৌ বলে—জানো না বুঝি, তোমার দাদা মেয়েদের কি ব্যবস্থা করেচে? মেয়েদের গাছের আমড়া দেখে দেখে ভাত খেতে হবে! বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসে।

মহাতাপ বলে—বৌ, আজ থেকে আমার খাবার দুজনে ভাগ করে খাব।

—দূর পাগল, আমায় না, মানুকে দিতে হয়।

—ওই ধুমসীকে, কভি না! [illegible]প রাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ধুমসী কিন্তু আড়ালেই ছিল, [illegible]কে। মহাতাপ কহে—কি?

—পয়সা চাইছিলে না?

—হ্যাঁ, আট আনা।

—পেলে?

—না, বৌ কোথা পাবে?

—তা বটে, জ্ঞাতির কাছে লক্ষ্মীও গরীব সেজে ছিলেন; এই নাও!

—জীতা রহো, জীতা রহো। বলিয়া মহাতাপ আধুলীটি তাহার হাত হইতে লইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে কহে, আচ্ছা পেলে কোথায় বল দেখি, হুঁ, সেই চামড়া-চোকো দেয় বুঝি, হুঁ, বুঝেচি, বৌ আমাকে ভালবাসে কিনা তাই তোমাকে টাকা এনে দেয়। আচ্ছা আমিও দেখচি।

মানদা হাসিবে না কাঁদিবে বুঝিতে পারে না, শেষে কাঁদেই, আর আপনার বাপকে গালি পাড়ে, আর পাড়ে ভগবানকে।

ওদিক হইতে বড়-বৌ হাঁকে,—ছোট বৌ, ও ছোট বৌ!

মানদার অঙ্গ জলিয়া যায়, 'কেমন করিয়া সে যে শোধ তুলিবে ভাবিয়া পায় না।

বড়-বৌ সাড়া না পাইয়া কহে—বলি, করচিস কি ছোট-বৌ, আমার পিণ্ডি দিচ্ছিস্ নাকি?

মানদা ঝঙ্কার দিয়া বলে—তোমার দিতে যাব কেন বল, দিচ্চি যে আমার অদেষ্ট তৈরী করেচে সেই মুখপোড়ার, দেখা পাই তো দেখি আমি একবার।

বড়-বৌ ওইখান হইতে বলে—মুখপোড়া বড় ভীতু লো, সে কিছুতেই দেখা

দেবে না, মিছে ঘরে বসে আছিস্, আয় দেখি, আমার কাজটা একটু এগিয়ে দিবি।

মানদার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মুখপোড়ার পাওনা-গণ্ডাটুকু ওই মুখপুড়ীর পিঠেই ঝাড়িয়া দেয়, কিন্তু আর-এক মুখপোড়ার ভয়ে তাও পারে না।

৫

সেদিন মহাতাপ বাড়ি ফিরিল বেশ একটু রং-এর মাথায়। বড় বড় চোখ দুটো লাল, আর ঢল ঢল সারা দেহখানাই যেন টলে, মুখখানা রাঙা অথচ থমথমে। সে আসিয়াই গম্ভীর গলায় হাঁকিল—বড়-বৌ, হামারা ছাতু লে আও!

বড়-বৌ বাহিরে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল, সে মহাতাপকে কোন কথা কহিল না, গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিল—ছোট-বৌ!

সে কণ্ঠস্বরে এবার মহাতাপও চমকিল, তাহার হিন্দী বাত কোথায় উড়িয়া গেল। সে বলিল—ছোট-বৌ তো পয়সা দেয় নি, আটা আনা পয়সা সে কোথা পাবে? মাইরি বলচি তোমার গা ছুঁয়ে।

বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়ে।

গায়ে হাত দিয়া মিথ্যা শপথ করিলে অঙ্গস্পৃষ্ট প্রিয়জন যে বাঁচে না, সে মহাতাপ জানিত। আপন ঘরে ঢুকিয়া মহাতাপ দেখে, পরিপাটি করিয়া আসনটি পাতা, পাশেই এক গ্লাস জল, এদিক-ওদিক চাহিতেই দেখে কোণে বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে, ঢাকা খুলিয়া সে বসিয়া গেল।

ওদিকে বড়-বৌ আরও গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে—ছোট-বৌ, বলি কানে সোনা পরেচ ক'ভরি?

এবার ছোট-বৌ ফোঁস করিয়া উঠে, সে পান সাজা ফেলিয়া সম্মুখে আসিয়া বলে—সোনা কোথায় পাব বল, সরকার-বাড়ির সুয়োরাণীরই সোনা জোটে না, তা কোথাকার ঘুঁটেকুড়ুনী···

বড়-বৌ কথার বাঁকা গতির মোড় ফিরাইয়া সোজা কহে—তাই বলি, চালে আমার হিসেব মত চলে না কেন, চাল বিক্রী করে করে···

মানদা ঝঙ্কার দিয়ে বলে—করেচি বেশ করেচি। সরকার-বাড়ির চাল-চুলো তো কারও বাপের বাড়ি থেকে আসে নি।

দোতালা হইতে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে একটা কথা আসিয়া পড়ে—সেই কথাটাই

মনে রাখতে বল বড়-বৌ, সরকার বাড়ির চাল-চুলো কারও বাপের বাড়ি থেকে আসে নি!

কণ্ঠস্বর বড়-কর্তা সেতাবের।

কথাটার উত্তর মানদার খর-জিহ্বাগ্রে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মরে, কিন্তু নেহাৎ লোকলজ্জায় বাহিরে আসিতে পারে না, সে ঘোমটার ভিতর গর্জায়।

উপর হইতে বড়-কর্তা আবার বলে—যত সব ছোটলোকের ঘরের মেয়ে!

এবার বড়-বৌ উত্তর দেয়—বাড়ির মেয়েদের কথা-কাটাকাটির ভেতর পুরুষমানুষের কথা কইবার দরকার কি শুনি, আর আমাদের বাপ তোলবারই বা তোমার অধিকার কি শুনি?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্রুদ্ধ মত্ত কণ্ঠ শোনা যায়—খবরদার, শুকুনি চামার কিপটে, মেয়েদের কুছ বোলেগা তো ছাতু চট্‌কে দেগা। ওঃ, বিয়ে করেচে তো মানুষ কিন্‌ লিয়া!

বড়-বৌ উপরে ছুটিয়া আসে, ভয় হয় বা সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়।

আসিয়া দেখে, সুন্দ তখন ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছে, আর উপসুন্দ তখনও দরদালানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছে—চামারকে সাথ হাম নেহি রহে গা, কাল হাম ভিন্ন হোগা!

হাতে-মুখে কালো কালো কি মাখা, তাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে।

বড়-বৌ তার হাতখানা ধরিয়া শুঁকিয়া কহে—এ কি ছাতু না খইল?

মহাতাপ দিব্য হাত চাটিতে চাটিতে বলে—কোণে ভিজে ছিল, গুড় দিয়ে দিব্যি লাগচে। হুঁ, ছাতুই বটে! বলিয়া আর একবার চাটে।

বড়-বৌ বলে—আমার আর ছুটকির মুণ্ডু, সে মাথা ঘষবার জন্যে খইল ভিজিয়ে রেখেছিল বুঝি···

বড়-বৌ তাহার হাত ধরিয়া কহে—এস, হাত ধোবে এস।

যাইতে যাইতে সিঁড়ির পথে আবার কহে—বলি, নেশা কি এমনি করেই করে যে স্বাদ-আস্বাদ···

মহাতাপের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সে বড়-বৌ'র হাত ছাড়িয়া সেই সিঁড়িতে হেঁট হইয়া বসিয়া বড়-বৌ'র পায়ের বদলে মাটিতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহে—গুরুর দিব্যি, তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কোন্‌ চণ্ডাল মিছে কথা বলে, মিথ্যে বলি তো···

বড়-বৌ শশব্যস্ত হইয়া কহে—আচ্ছা, আচ্ছা, ওঠ ওঠ! বলিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দেয়।

—বিশ্বাস হল না, ধরে তুলতে চাচ্ছ, আচ্ছা দেখ। বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মোড়ের মুখে গড়াইয়া পড়ে, তবু সে বলে—মিথ্যে বলি তো ধুমসীর মাথা খাই, বলিয়া পড়িয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দেয়ঃ

'মূর্খে বলে সুরা, মায়ের প্রসাদ কারণ বারি···'

বড়-বৌ পরম যত্নে তাহাকে দুই হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, মহাতাপও এবার তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া উঠিতে উঠিতে কহে—যার বড়-বৌ নেই, তার আর কেউ নেই!

বড়-বৌ অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই দেখে উপরে সিঁড়ির মাথায় সেতাব, সাপের মত নিমেষহীন হিংস্র দৃষ্টি তাহার চোখে; চোখাচোখি হইতেই সেতাব বলে—বটে, এই জন্যে এত! লোকে দেখি মিথ্যে বলে না!

বড়-বৌ ঘৃণায় মুখ ফেরায়, এ পাশেও ঠিক অমনি দুটি চোখের দৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরাইতে চায়—নীচে ঠিক সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ছোট-বৌ মানদা।

মানদা বলে—যা ঘটে তাই রটে, আর তা সত্যই বটে, কথাটা দেখি মিথ্যে নয়। লোকে মিথ্যে বলে না। বলিয়াই চলিয়া যায়।

বড়-বৌ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—কি বল্লি ছোট-বৌ?

নেপথ্য হইতে উত্তর আসে—বলছিলাম আজ মাসের ক'দিন হল, জান গো বড়-গিন্নী?

বড়-বৌ মহাতাপকে ছাড়িয়া দিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, মহাতাপ আবার সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বড়-বৌ বহু কষ্টে মহাতাপকে তাহার ঘরে শোয়াইয়া দিল। তারপর নীচে আসিয়া দাওয়ার উপর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে তাঁহার স্নায়ু, শোণিত-প্রবাহ, হৃৎপিণ্ড, সব যেন নিশ্চল অসাড় হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ কাটিয়া যায়, উপর হইতে শব্দ উঠে, ওয়াক্ ওয়াক্! মহাতাপ বমি করে।

মানদা তাড়াতাড়ি উপরে যায়; ক্ষণপরেই মত্ত কণ্ঠে শোনা যায়—নেহি মাংতা হ্যায়, ভাগো তুম্, ভাগো ধুমসী, গিধ্বড়-বদনী, ভাগো!

মানদার তীব্র কণ্ঠ শোনা যায়—কে তোমার চাঁদবদনী আছে শুনি, নরক সাফ করে কে দিয়ে যাবে শুনি ?

মহাতাপ হাঁকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ !

মানদাকে পিছন হইতে আকর্ষণ করিয়া বড়-বৌ বলে—পাগলের কথায় রেগে কি হবে, সরে আয়, আমি পরিষ্কার করে দিই।

মানদা একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। সেতাব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—একগাছা দড়ি নিয়ে গলায় দিও।

তাহার বুকের পুঞ্জিত ঈর্ষা ফাটিয়া পড়িতে চায়।

৬

এই ছাতুপর্বের ফলেই, সরকার-বাড়িতে সত্য সত্যই কুরুক্ষেত্রে বাধিয়া গেল।

সেতাবের মনে মহাতাপ ও বড়-বৌ'র নিবিড় আকর্ষণের ফলে যে স্বাভাবিক সন্দেহ ছিল, সে আজ ভীষণাকার ধারণ করিল। সেতাবের আর সহ্য হইল না, ঠিক পরের দিনই সে প্রাতঃকালে সদরে বসিয়া মহাতাপকে ডাকিয়া বলিল—তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নাও, এক জায়গায় থাকা আর পোষাবে না।

মহাতাপ প্রবল উৎসাহে বলিল—বহুৎ আচ্ছা, আমিও তাই চাই। আর বড়-বৌ বলছিল, গাছের আমড়া দেখে সে আর ভাত খেতে পারচে না।

পাগলের প্রলাপ সব সময় বোঝা যায় না, তবুও সেতাব তার মুখে বড়-বৌ'র দুঃখের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া গেল। সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আপন মনেই কহিল —হ্যাঁ, বাপের বাড়ি গিয়ে খুব দুধে-ভাতে খাবে।

মহাতাপ কিন্তু কথাটা শুনিল না, তৎপূর্বেই উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল সু-সংবাদটা দিতে ; সেতাব আবার তাহাকে ডাকিল—শোন !

—কি ?

—আজই সব ভাগ হবে, আমি মাতব্বর-মুরুব্বিদের খবর দিয়েছি, আমাদের পাড়ার রামবাবু, তারু জ্যেঠা, ইন্দির-দাদা, ও-পাড়ার ফকির মোড়ল, কালাচাঁদ বাবু। দেখ, এ ছাড়া আর কাউকে ডাকব ?

মহাতাপ বলে—আবার কে ? ওই হবে।

বেশী কথা বলিতে আর তাহার বিলম্ব সহিতেছিল না, সে সায় দিয়া বাড়ি ফিরিল!

সেতাব হাঁকিল—সরকার মশায়। সরকার আসিয়া সবিনয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলায়।

সেতাব বলে—পালকি বেহারা বলে রাখুন, বড়-বৌ কাল বাপের বাড়ি যাবে। আর একটি কনে, আচ্ছা, সে পরে হবে।

বাড়ির বাহির হইতেই মহাতাপ হাঁকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ! রান্নাশালে বড়-বৌ বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল; সে তাহার ডাকে আজ আর হাসিয়া সাড়া দিল না, শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল; দারুণ বিষণ্ণ মুখ।

সে সব কিছু আজ মহাতাপের চোখে পড়িল না; উৎসাহে বলিল—কি দেবে বল?

বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে, মহাতাপের তা ভাল লাগে না; সে প্রবল ধমক দিয়া বলে—বলি কথা কইচ না যে?

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া কহে—কি বলব বল?

কথার জবাব পাইয়া মহাতাপ বড় খুসি, সে বলে—এখন দুটো জোয়ান-মৌরী দাও দেখি, ছাতুর অম্বল আজও মরে নি।

বড়-বৌ বলে—জোয়ান-মৌরি তোমাদের বাড়িতে কখনও আসে, যে পাবে!

—কেন ওই যে রান্নার পাটায় রয়েছে, ওই যে!

বড়-বৌ'র অতি বিষণ্ণ মুখও কৌতুকে ঈষৎ উজ্জল হইয়া উঠে, সে বলে—আমার পোড়াকপাল, ও-যে ধনে আর সম্বর!

মহাতাপ দিব্য বলে—বেশ, ওই তো রোজ নিয়ে খাই আমি, ওতেই তো আমার বেশ অম্বল মরে।

বলিয়া নিজেই দুইটা ধনে তুলিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলে—হ্যাঁ, তার পর শোন, আর আমড়া দেখে ভাত খেতে হবে না। আজ ঠিক হয়েছে, আজই ভিন্ন হব, বিষয় ভাগ হচ্ছে।

ওপাশ হইতে মানদা বক্র-হাসি হাসিয়া বলিল—তবে তো বড়-বৌ'র মাছের মুড়োর বরাদ্দ হবে।

আনন্দে বিভোর মহাতাপ আজ আর রাগে না, সেও ব্যঙ্গ করিয়া কহে—না, তুই খাবি! বুঝলে বড় বৌ, চিমড়ের হাত আর ধুমসীর ব্যাড়র-ব্যাড়র

আজ থেকে ঘুচবে, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব।

বড়-বৌ তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া ছোট-বৌকে বলে—কি করব বল্‌ ছোট-বৌ, ভাসুর তোর আমাকে নেবে না, আমার আমড়া দেখে দেখে ভাত খাওয়া সত্যই ঘুচেছে।

মহাতাপ মাটিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠে—নি—শ্চ—য়! নইলে আমার নামই মিছে দেখো তুমি। আর ধুমসী, বুঝলি কিনা, এমন ভাগ করব যে তোর ও ব্যাড়র-ব্যাড়র জন্মের মত ঘুচোব, তবে আমার নাম!

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানদা খুসি হইয়া দেড় বছরের ছেলেটাকে লইয়া বুকে চাপিয়া আদর করে।

৭

পাঁচ পঞ্চায়েৎ মিলিয়া বিষয় ভাগ করিল, মহাল, জমি, পুকুর, বাগানবাড়ি, বাসন, আসবাব—সমস্ত।

সেতাব কহিল—আজই তাহ'লে বাড়ির সীমানা নির্দিষ্ট করে পাঁচিল গাঁথতে লাগানো হোক···ইট, মসলা, রাজ-মজুর সবই মজুত।

একজন পঞ্চায়েৎ বলে—তাড়াতাড়ি কি?

সেতাব বলে—জানেন না, এরপর সীমানা সহরদ্দ নিয়ে কত গোলমাল হয়!

তাহাই হইল, বাড়ির পাচিল উঠিতে আরম্ভ করিল।

'বড়-বৌ' 'বড়-বৌ' বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে মহাতাপ পরম আনন্দে আপন ঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। মানদা কাপড় সাঁটিয়া বাসন-আসবাব ঘরে তুলিতেছিল।

বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার কার্যের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাতেও যখন তাহার ওই দৃষ্টির সূচিকায় মানদার চৈতন্য হইল না, তখন সে বলিল—বলি, হচ্ছে কি?

মানদা একগোছা বাসন তুলিয়া তাহার পানে না তাকাইয়া চলিতে চলিতে বলে—চোখের মাথা খেয়েচ নাকি?

মহাতাপ চটিয়া কহে—চোখের মাথা খায়নি, তোর মাথা খাব। বলিয়া গিয়া তাহার কাঁধে একটা কর্কশ ঝাঁকানি দিয়া বলে—তুই এখানে কেন?

মানদা এবার আর কিছু বলিতে পারে না, সে পরম বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

মহাতাপ আবার কহে—যা তুই নিজের ভাগে যা, ওই বড় তরফ, বড়-বৌ এখানে আসবে।

মানদার হাত হইতে বাসনের গোছাটা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া যায়, ঘৃণা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তারপর সব ফেলিয়া দিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া, মেঝেতে লুটাইয়া কাঁদে।

মহাতাপ অতি রোষে পঞ্চায়েৎদের সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়া বলে—বাঃ, এ কি রকম হল! বড়-বৌ নিজে আমাকে বলেচে দাদা তাকে নেবে না, তাই আমি কিছু বলি নি, এখন ছোট-বৌ কেন আমার ঘরে গিয়ে জ্বালাচ্ছে?

পঞ্চায়েতের পঞ্চ বিজ্ঞ মস্তিষ্ক এ কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাওর পায় না, তাহারা অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকে।

সে আবার বলে—এখন আপনারাই ভাগ করে দেন; ভাগের সময় একটি কথাও আমি বলি নি। আমি বলছি বড়-বৌ আমার ভাগে···

সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ফকির মণ্ডল অবাক হইয়া কহে—বৌ ভাগ!

অসহিষ্ণু মহাতাপ বলে—হ্যাঁ, ছোট-বৌ দাদার ভাগে।

কথাটায় পঞ্চায়েৎ পঞ্চমুখে রাম নাম স্মরণ করে।

সেতাব কানে আঙুল দেয়, চক্ষু তাহার জ্বলে।

মহাতাপ ছাড়ে না, সে আপন মনেই বলিয়া যায়—ছোট-বৌ তাকে দেখতে পারে না, ছোট থেকে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া; আর দাদা নিজে বড়-বৌকে নেবে না বলেচে—

পঞ্চায়েৎ সেতাবের মুখপানে চায়, সম্মতির জন্য নয়, শেষের কথাটার সত্যতা নির্ধারণের জন্য।

সেতাব দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝিয়া বলে—নিঃসন্তান, বংশ তো চাই; জানেন তো পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। পাঁচ পঞ্চায়েৎ একবাক্যে কেরামৎ করিয়া উঠে।

মহাতাপ বলে—তা হ'লে?

ওপাড়ার রামবাবু বলে—এত গাঁজা খেও না মহাতাপ, এত গাঁজা খেও না! একে পাগল আরও পাগল হবে।

—কেন?

—নইলে বৌ ভাগ করতে বলো, বৌ কি ভাগ হয়?

প্রবল প্রতিবাদে হাত চাপড়াইয়া মহাতাপ বলে—আলবৎ হয়, কেন হবে

না শুনি? ওই তো সতীশবাবুদের বাড়ির পদ্ম-বৌ আর কাঞ্চন-বৌ।

আঃ, ওদের একজন হল মা, আর একজন হল নিঃসন্তান খুড়ী।

মহাতাপ আর দাঁড়াইয়া শোনে না, সে আপন মনেই বকিতে বকিতে চলিয়া যায়—যত সব কাজীর বিচার, পঞ্চায়েৎ না আমার ইয়ে···

৮

ঘটনার দিন রাত্রেই সেতাব বড়-বৌকে শাসাইয়াছিল—এ সবে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তোমাতে তার বেশ পরিচয় পাচ্চি।

আনন্দময়ী বড়-বৌ সেদিন সেই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে যেন মূক হইয়া গিয়াছিল, আর জঘন্য কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না; সে শুধু তাহার পানে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইল। সেতাবের রাগ তাহাতে বাড়িয়া যায়, মেয়ে-মানুষের এত তেজ; দোষ করিয়া আবার চোখ রাঙায়।

সে কহিল—মনে হচ্ছে, গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে দি।

বড়-বৌ শান্ত কণ্ঠে বলে—তাই দাও।

—তাই দাও! সেতাব এদিক-ওদিক অল্পক্ষণ ঘুরিয়া শেষে বিছানায় শুইয়া বলিল—নাঃ, দুষ্টা স্ত্রী আর সাপ দুই সমান; খুনের দায়েই বা পড়ি কেন! তুমি মা-বাপের ছেলে, মা-বাপের কাছে যাও, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। খোরপোষ দেব আমি। বলিয়া শুইয়া পড়ে। বড়-বৌ মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া শোয়।

তাই বড়-বৌ ভাগের দিন ছোট-বৌকে ও কথাটা বলিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যায় সেতাব আসিয়া খট্ খট্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, বড়-বৌ সম্বন্ধে তাহার যদি বা কোন দ্বিধা ছিল, তা আর এখন নাই; মহাতাপের বৌ-ভাগের কথায় সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেছে।

ছি, ছি,ছি! পঞ্চায়েতে মনে করিল কি? পাঁচজনের যে আর সন্দেহ রহিল না! আর, পাঁচ জনেরই বা দোষ কি, অতি আকর্ষণ ভিন্ন কি মহাতাপ ও কথাটা বলিতে পারিত?

উপরে খাবারের ঠাঁই তৈয়ারী ছিল, বড়-বৌ ভাতের থালাটা লইয়া গিয়া নামাইয়া দিল। সেতার অতি রোষে পায়ে করিয়া থালাটা সরাইয়া দিল। বড়-বৌ একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—আমার ছোঁওয়া খাবে না? সেতাব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কেমন হইয়া গেল। এমন সংযত দৃপ্ত মহিমা সে কখনও দেখে নাই, সে চোখ নামাইল।

বড়-বৌ ধীরে ধীরে থালাখানি তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেতাব পিছন হইতে বলিল—কাল তোমায় যেতে হবে।

বড়-বৌ পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয়—বেশ।

সেতাব আবার বলে—গহনাগাঁটি কিছু পাবে না তুমি।

দৃঢ় পদক্ষেপে, অকম্পিত শিখার মত দৃপ্ত মূর্তিটি তখন চলিয়া গিয়াছে। সেতাব আপন মনেই দাঁতে দাঁত ঘষে।

বড়-বৌ কিন্তু আর আসে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতাবের উৎকণ্ঠা ও উগ্রতার সীমা থাকে না।

গলায় দড়ি দিল নাকি?

সেই মুখখানির চোখ বড় হইয়া আসিতেছে, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেতাবের বুকখানা ফাটিয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি ডাকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ!

উত্তর নাই।

সেতাবের মনে বিদ্যুতের মত একটা কথা জাগিয়া উঠে।

হয়তো মহাতাপের কাছে···

সে দেওয়ালে ঝুলানো মরিচা-ধরা তলোয়ারখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে হয় না; সামনের খোলা বারান্দায় বড়-বৌ নিস্পন্দ পড়িয়া।

ডাকিতে তার ভরসা হয় না, অপরাধীর মত সে ঘরে আসিয়া শোয়।

ভোর বেলা তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

কে যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। সেতাবও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

হ্যাঁ বড়-বৌ'ই বটে। পা টিপিয়া টিপিয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে সেতাবের সন্দেহ জাগে। সেও পিছন ধরিয়া চলে।

বড়-বৌ গিয়া মহাতাপের ঘরে উঠে।

৯

তখন পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, মহাতাপ গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছে, পঞ্চায়েতের পঞ্চ-প্রবীণ-মস্তিষ্ক-দত্ত জ্ঞানে তাহার আক্কেল জন্মাইয়া গেছে। মানদা ঘরে শুইয়াই আছে, বাসন-আসবাব সব এখনও বাহিরে পড়িয়া।

বড়-বৌ চুপি চুপি আসিয়া মহাতাপের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মহাতাপ সানন্দে বলিয়া উঠিল—বড়-বৌ!

ঘরের মধ্যে মানদার বুকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে উঠিয়া বসে, উদগ্রীব হইয়া শোনে।

বড়-বৌ মৃদুস্বরে বলে—চুপ কর, আস্তে কথা কও, এইটে নিয়ে রাখ।

বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া সম্মুখে ধরে।

মহাতাপ বলে—কি এ?

মৃদুস্বরে বড়-বৌ বলে—টাকা, তোমার দাদা তোমাকে নগদ টাকায় ফাঁকি দিয়েচে, যা পেরেচি এনেচি, নাও।

মহাতাপের বুদ্ধি মহাতাপকেই ভাল, সে বলে—না, নিয়ে কি করব আমি?

এ প্রশ্নের উত্তর বড়-বৌও দিতে পারে না, শেষে সে বলে—তোমার না দরকার থাকে, মান্তু, খোকা···

উদাসভাবে মহাতাপ বলে—দাও গে তবে সেই ধুমসীকে, আমি আর ঘরেই থাকব না।

অতি ম্লান হাসি হাসিয়া বড়-বৌ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলে—ছিঃ, পাগলামি কি করে, ঘরে থাকবে না কি?

মহাতাপের কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়ে। সে বলে—কার কাছে থাকব বৌদিদি, মা নেই, বোন নেই···

বড়-বৌ'র চোখে জল আসে, প্রাণপণে অশ্রু রোধ করিয়া সে হাসিয়া তরল ভাবে কহিতে চাহিয়া বলে—কেন বৌ'র কাছে, মান্থর কাছে।

—ধ্যেৎ বৌ'ই বুঝি সব? মা-বোন নইলে কি ঘর বৌদিদি?

বড়-বৌ কথাটা তরল করিবার চেষ্টাতেই পরিহাস করিতে চায়—তা আমিও তো মা-বোন নই···

মহাতাপ বলে—না, কিন্তু তুমি যে বড়-বৌ, তুমি থাকলে মা-বোনের কষ্ট যে বুঝতে পারি না আমি। দাদা তো কথাই কয় না, আমি যে ভিখিরী, বলে মুখ্যু ডাং, বৌ আড়ালে বলে, মুখপোড়া, তুমিই শুধু ভাল কথা বল।

বড়-বৌ আর অশ্রু রোধ করিতে পারে না।

পিছন হইতে মানদা গায়ে হাত দিয়া বলে—দিদি, ওটা তোমার কাছেই রাখ না, ওকে তো জানো, আর আমি তো বড় উড়ন-চণ্ডে!

মহাতাপ বলে—শুনচ বড়-বৌ, শুনচ, মার না খেলে···

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া বলে—তুমি একটু থাম ভাই। এটা তুইই রাখ্, মানু, কাল তো বলেচি, আমার এ বাড়ির ভাত উঠেচে। সব বলি নি, শোন, আজ পালকি আসচে, আমার বনবাস। তোর ভাসুর আবার বিয়ে করবে।

মহাতাপ আর চুপ করিয়া থাকে না, সে স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে—কি! বিয়ে করবে?

বড়-বৌ জোড়হাত করিয়া বলে---চুপ কর ভাই, চুপ কর, রাজ-মজুর আসতে শুরু করেছে।

মহাতাপ চুপ করিয়া যায়। ওদিকে ঘরের মাঝে খোকাটা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে।

বড়-বৌ বলে—খোকা উঠেচে ছোট-বৌ, ওকে আন্ তো, যার ধন তাকেই আমি দিয়ে যাব।

ছোট-বৌ খোকাকে লইয়া আসে, বড়-বৌ তাহাকে কোলে লইয়া বলে—নাও তো বাবা। বলিয়া টাকার পুঁটুলিটা তার হাতে দেয়।

কথা শুনিতে শুনিতে সেতাবের সর্বাঙ্গ হিম হইয়া যায়, চোখ দিয়া জল আসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুকটা হাল্কা হইয়া উঠে।

সে ডাকে—বড়-বৌ!

সকলে সেতাবকে দেখে।

মহাতাপ বলে—শুকুনি সব শুনছিল বড়-বৌ, আমি বলি দরজার আড়ালে ওটা কাপড়।

সেতাব ফট্ ফট্ করিয়া চটিটা টানিতে টানিতে আসিয়া কহে—টাকাটা দাও তো, ছেলেমানুষ কোথা ফেলবে!

বলিয়া টাকাটা লইয়া বলে—দাও তো একবার খোকামণিকে কোলে করি।

বলিয়াই নিজেই বড়-বৌ'র কোল হইতে তাকে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া বলে—আমি সব শুনেচি বড়-বৌ!

বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে।

সেতাব আবার বলে—এতে খোকার এক-গা গহনা হবে, কি বল? বলিয়া টাকার পুঁটুলিটা নাড়িয়া ওজন দেখিল।

আবার বলে---বংশের মানিক ও, খালি গায়ে ভাল লাগে না। খোকার হয়েও তোমার আর ছোট-বৌমার দু'খানা করে হবে, কি বল? আঃ, কি যে

তোরা ঠন্ ঠন্ করিস বাপু, যা, যা, এখানে পাঁচিল গাঁথতে হবে না, সদরের পাঁচিল যেটা ভেঙে গেছে গাঁথগে যা। আর বল্ গে যা, পালকি চাইনে।

বড়-বৌ স্বামীর মুখপানে তাকায়। সেতাব অতি মিষ্ট হাসিয়া কহে---কত ভুলই মানুষের হয়। বলিয়া খোকাকে আড়াল দিয়া হাতজোড় করে।

রাজ-মজুর চলিয়া যায়, বড়-বৌ কাঁদে, মানদা হাসে, মহাতাপ অবাক!

খোকামণিকে আদর করিতে করিতে সেতাব বলে—গ্রহের ফের আর কি, কতগুলো টাকা নষ্ট,, পাঁচিলটা গাঁথা, ক'টাকা গেল আবার ভাঙতে···

মহাতাপ এতক্ষণে লাফাইয়া উঠিয়া বলে—হ্যাঁ, তোমার মত চাঁমদড়ির পয়সা লাগে, ও পাঁচিল আমি তিন লাথিতে···

বড়-বৌ মহাতাপের হাত ধরিয়া বলে—থাক্, শেষটা আমাকে পদসেবা করিয়ে ছাড়বে। সেঁক করতে আমি পারব না।

সেতাব হা হা করিয়া হাসে।

এটা তাহার নূতন।

প্রতিমা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশের মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙও ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভালো, মাঠে ধানের রং কসকসে কালো, আর ঝাড় গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থবাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গেছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজার কাজের কি অন্ত আছে।

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা, ও মেয়ের হল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা দু হাতে উয্যুগ করে কি কুলিয়ে উঠতে পারি ?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোঁচ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গেছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বালতিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বুউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলঙ্কারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটি পড়িলে হয়।

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা তো কেউ, দেখে আয় তো দেরি কত ? ছেলে-গুলো সব গেল কোথায় ?

একটি মেয়ে বলিল, সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে বসে আছে।

সত্যই সব ছেলেরা তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া ছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বৃত্তিগুলো আমাকে দিবি ? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি ?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখ, আগ কর কেন গো! উ মাটি আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি ? বলে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না ?

বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই ? না, হাঁকই দাও না রাত্তিরে ?

ওই দেখ, কি বলে দেখ, হাঁক না দিলে হয় ? একবার করে তো বেরুতেই

হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি করে জানব বল? ভুল হয়ে গেইছে।

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হল তোমার? মেয়েরা যে গোলা গুলে বসে আছে গো! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল-নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনি দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনি খরগতিতে। কুমারীশ গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তারস্বরে চীৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ করতে পারব না। কোন উয্যুগ নাই, মাথা নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি করব বলুন?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল, তারপরে ভাল আছেন মা? ছেলেপিলেরা সব ভালো? বাবুরা সব ভালো আছেন? দিদিরা, বউমারা সব ভালো আছেন?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ সব ভালো আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস, সে আক্ষেপপূর্ণকণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ জ্বর—সব 'পইলট্ট' খেলছে মা। ডাক্তার-বদ্যিতে ফকির করে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চান করবেই বা কখন, খাবেই বা কখন?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, কেবল এই বেশ্যের আগনের মাটি লাগে কিনা তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেন ওই বেটা বাউড়িকে যে, মাটি কই? বাবু ভুলে গিয়েছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঁঃ, উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ! বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল। আমারই হয়েছে

এক দায়, যাই, এখন কোথা পাই বেঙ্গের বাড়ি, দেখি! হারামজাদা বাউড়ি, বলে গাল দেবে! আরে, গাল দেবে কেন? কই, আমাকে গাল দেয় না কেন? যত সব—! দক্ষিণে তো সেই মামুলি বারো টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু?

· গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর-বাজারের মতো প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোনো রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নীচ শ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী, এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব?

অদূরে একটা গাছতলায় চার-পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ামুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী, মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া।—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া একটা মত্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

এই যে, এই যে সব বসে রয়েছিস। তারপর সব ভালো আছিস তো দিদিরা? রং নিয়ে আসিস, যাস সব, যাস। এবার ভাদু কেমন গড়ে দিয়েছিলাম, তা বল?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি? কেনে, কেনে তুমি লিবে, শুনি?

লে লে, কেড়ে লে মুখপোড়ার হাত হতে। লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি, প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রং দেব, তুলি দেব, যেও সব। পদ্ম আঁকবে দোরে!

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর ধর, বুড়োকে ধর।

একজন বলিল, সবাইকে রং দিতে হবে কিন্তুক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রং দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা-মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘষিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড় মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছাপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড়বউ।

বড়বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজ-ননদের গায়ে কাদা দিল না, সে বড়-ননদের গায়ে গোলা দিয়া বলিল, তারপর ভাই বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া মেজ-বউয়ের মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজগিন্নী।

মেজবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর সাটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদা-গোলা লইয়া মেজ-ননদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয় নি বুঝি?

মেয়েদের হাসি কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমায় বুঝি ডাকতে নেই বড়দি! আমি বলে কত সাধ করে বসে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস করে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও না বউমা। অমূল্য দেখলে অনর্থ করবে মা, কেলেঙ্কারির আর বাকি থাকবে না। তুমি সরে এস।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা ন্যাতা দেওয়ালে উঠল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড় বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চড়ে মাটি দেবো? কই, গিন্নীমা কই? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হলে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ—

বাড়ির চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার গেল কোথা? তুমি জান বড়বউমা?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ মা! ছি, বার বার বলে তোমাকে পারলাম না! যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটা টানিয়া দিয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা? আহা-হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকুরুন গো, অ্যাঁ, এমন চেহারা তো আমি দেখি নাই! আহা-হা! অ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, ছোটবাবু আমাদের অ্যাঁ—ছি ছি ছি!

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু? অ বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায়?

কুমারীশ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা বটে; আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ

কি ? হ্যাঁ, তা বটে, তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা-হা, এমন মুখ তো আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমিও যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প কোরো না, যাও, আপনার কাজ কর গে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার বলে কত কাজ পড়ে আছে! সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার বলে মরবার অবসর নাই!

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো!—সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়তো অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশির মতো নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মতো সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্যজীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যর বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারি আছে, তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মুগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খান দশেক রুটি অথবা পরটা খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাড়ি ফিরিত বেলা দুইটায়। তারপর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরও খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোনোদিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার-প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরনের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া-পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে

প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য অত্যাচারীকে হত্যা করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় নত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে মাথা আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ঐ বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সর্তকবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যমুনা ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতে ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহুদিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না মিস্ত্রী, দেবে না।

সে বলিত, দেব গো, দেব।

কবে দেবে?

কাল।

না আজই দাও, ও মিস্ত্রী!

হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুরই তো তোমার, আবার কাত্তিক দিয়ে কি হবে?

না, আমায় কাত্তিক গড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের খ্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে—! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মত মুখখানি যেন জলজল করিতেছে। সে স্থির করিল, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি? প্রতিমে যে সাতাশখানা, তা মনে আছে?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেন। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মরগা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া থলথল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

অপ, অপ, অ্যাও, অপ!

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চ কণ্ঠে শাসন বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই তো রে, চৌকিদারই বটে! উঃ, খুব বলেছিস বাবা! রাত অনেক হয়েছে রে! হুঁ, রাত একেবারে সনসন করছে! নে, একবার তামুক সাজ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

অপ অপ, কোন হ্যায়? অ্যাও উল্লুক!

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোকে সভয়ে দেখিল, অসুরের মতো দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছাটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, অ্যাও, উল্লুক!

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু পেনাম, ভালো আছেন?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, এ শ্লাই ফক্স মেট এ হেন। শ্লাই ফক্স মানে খ্যাঁকশেয়ালি। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা!

মিস্ত্রী তাহাকে খুশি করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভালো আছে ছোটবাবু?

শরীর, নশ্বর শরীর। আইরন মেন—লোহার শরীর। দেখ, দেখ!—বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

দেখ, টিপে দেখ!—অপ!

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাতখানায় আঘাত করিয়া বলিল, টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, কঁ্যাকঁ্যা—কঁ্যাটক্যাট। নানা-প্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন হ্যায়! অ্যাও!

বাঁশবাগানের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমান ভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছাটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

আলবৎ ভূত, কিংবা ছেনাল লোক ইশারা করছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চরিত্র খারাপ। ওই শালা যদো, যদো শালা বাঁশি বাজায়, শালা কেষ্ট হবে! শালা মারে ডাণ্ডা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেইদিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও, শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ।

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময় ঊর্ধ্বলোকে, বোধ করি, দেবতার উদ্দেশেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জে-বাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোটবধূটি। আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে, সে খেয়াল বোধকরি তাহার নাই। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নীচে

অমূল্যের সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপ অপ—আও, আও, আও—অপ!—বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চল, টানতে টানতে চল বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙেছে! গা হাত পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নীমাকে ডেকে দাও বরং, ও কি!

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ বলিল, ওগো, ও ছোটবাবু, ছোটবাবু!

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মতো তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না! সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'তুষ্মৃত্তিক অর্থাৎ তুষ-মাটির উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙুল জুড়িয়া মাটির কাজ সারিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গেছে। পূজার কয়দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমী ও একাদশীর দিনেব খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ। অন্তত পাঁচ শত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড়মেয়ে, মেজবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজমেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া

মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মসলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে, সে বারান্দার এক কোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায়ে লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই, গিন্নীমা গেলেন কোথায়? এ কি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁধে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় করলে! তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে কিনা, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুন বলেছেন বেশ। ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ী কী বলত, জানেন? বলত, কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে তো লোকে মনে করবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হল। এখন কী চাই বল দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল। তোমার, ঠাকরুন, বড় ট্যাকটেকে কথা! না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই,তা ঠাকরুনরা জানে না নাকি? আমার তো বাপু, এক জায়গায় বসে হাঁড়ি ঠেলা নয়, সাতাশখানা—

বাধা দিয়া বড়বউ বলিল, সব ঠিক করে রেখেছি বাবা, গোছানো পাট করা সব ঠিক হয়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া বলিল কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও তো ভাই, ওই কাঠের সিন্দুরের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপিচুপি কহিল, বড়বউমা, আমাদের ছোটবাবু এখনও তেমনই রাত করে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল, কেন বল তো ?

এই---না, বলি, ঘরথাই হল নাকি, মানে, ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপিচুপি বলিল, আমাকে যা বললে বেশ করলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ করবেন, ছোটবাবু শুনলে তো রক্ষে থাকবে না।—বলিয়াই সে থালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলি বাহির করিয়া আনিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে তো মার কাছে এসে চাইবে, আমরা আর দিতে-টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজদিদির মতো একটা হাতি গড়ে দিতে বল না দিদি !

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে তো আমি দিয়েছি মেজদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতি গড়ে এনে দেব। হাতির ওপর মাহুত সুদ্ধু।

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় তো পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া পালাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল, মাটি করলে রে বাবা, মা করলে ! কই কই, বিষকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে। ধর ধর, যোগেশ, ধর সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়। আর যে বিশ্রী গন্ধ ! ছেলেদের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হয়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়া ছিল। সমস্ত

বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপদপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও বেশ। উহারা গুজগুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে, একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে। আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখের মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেণ্ট-করা মেঝের মত পালিশ হইবে।

বউমা, জেগে রয়েছেন মা!

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল, মাথায় ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিভ কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে!

আমি খুব ভালো হাতি গড়ে এনে দেব এক জোড়া। দুটো মাটির বেরাকেট এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসঙ্কোচে আবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, ব্রাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গড়ে দিও। যেন তারাই মাথায় করে ধরে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি করে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোনটা ভালো হইবে।

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়ি মাছ গড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটাটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

চিংড়ি-মাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়ি-মাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতিই এনে দিও শুধু।

কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি? সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরোনো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিশুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রীর এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল—ওই দেবীপ্রতিমাটির মতোই।

অপ, অপ, চলে আও, বাপকো বেটা হোয় তো চলে আও!

অমূল্য আসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

অ্যাই মিস্ত্রী!

ছোটবাবু, পেনাম!

ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হয়েছে শালা, মারব এক ঘুসি, শালা ট্যাক্সো লিবে। শালা ফিস্টি করে খাচ্ছে পাঠা মাছ পোলাও, শালা! হাম দেখে লেঙ্গে!

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, অ্যাও, কোন হ্যায়? খোল কেয়াড়ি!

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ, চোপ বলছি চোপ!

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রং লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা

প্রকাণ্ড ডালায় করিয়া ব্রাকেট, হাতি, ঘোড়া, চিংড়ি-মাছ, এক জোড়া টিয়াপাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অমূল্যকে না বলে এই সব কেন বাপু? তা এখন দাম কি নেবে বল?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম? এর আবার দাম লাগে নাকি মা? দেখুন দেখি! আমারও তো বউমা উনি।

বড় মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হলেন বড়দিদি!

সে দ্রুতপদে পালাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে বোলো না যেন বউমা। যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী! ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা?

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতি দুটো মেজদির চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

তুমি একটু বোসো মা, আমি চক্ষুদানটা করে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুনের চোখ, মা।

যমুনা এই স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অ্যাও, কোন হ্যায়? চুরি--চুরি করেগা! ছেনালি করেগা! শালা, মারে গা ডাণ্ডা! অপ, অপ!

কোনো কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তর ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বল দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়ি-মাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা হ্যায়, মারে গা কামড়?

যমুনা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাত রে পক্ষীরাজ—চিঁ হিহি!

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

মিস্ত্রী—শ্লাই ফক্স—ওই খাঁকশেয়ালি? অ্যাই মিস্ত্রী!—সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, দি শ্লাই ফক্স ইজ এ গুড ম্যান, আচ্ছা আদমী।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় তিনি চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সন্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনোরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পালাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু বাড়িতে তখনও মৃদু গুঞ্জনে ঐ আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ওকথা আর ঘেঁটো না। ছি ছি ছি রে, আমার কপাল!

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ করলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়শী তো গা টেপাটিপি করছে!

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার একটুকুন রূপ থাকে, তাকে একটুকুন সাবধানে থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধানে রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ কর, তোমাদের পায়ে ধরছি। অমূল্য শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সন্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী-প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব!

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা

যমুনার মাথায় পাহাড়ের মতো চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভালো যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজা-বাড়িগুলির বলিদানের খবরাদি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাঠে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়, খানিকটা ঘি ঢালিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পায়তাড়া নাচ নাচে। রাত্রে কোনোদিন লোকজনে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোনো দিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতোই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ খেপে গেইছে। লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, 'আমার বউয়ের মতো অ্যা—,' আর 'অপ অপ' করছে।

বাড়িসুদ্ধ সবাই শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যের এই কয়েকদিন অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যজ্ঞানহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের আকস্মিক আগমন সম্ভাবনায় সে দিশাহারার মতো খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর। এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পাশের বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরেই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে। অপ, অপ! মা কই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ মা, ফার্স্ট, চাকনার মধ্যে ফার্স্ট! দুগগা-মায়ের মুখ ঠিক বউয়ের মতো মা! দুগগা-প্রিতিমে! অ্যাই ছোটবউ, অ্যাই! কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ের সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মতো চীৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল। সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গামছা, পূজার যত কিছু সামগ্রী, মায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহারও পাওনা অনেক। পরনে তাহার নতুন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পুতুল ও খেলনা। সে হনহন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের—মুড়কি নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝিটা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া গেল।
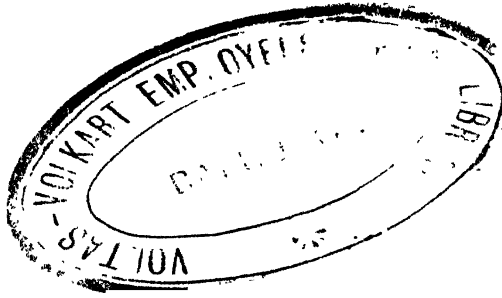
প্রত্যাবর্তন

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগে বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাৎলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি, মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোষাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলেপাড়ার সকলে ভাবিয়াছিল কোন অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোষাক-পরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়িটার দিকে পড়িতেই সে-দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল—ভ্রূর কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটিমাত্র আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল, এই কাম ইয়ার—ইধার আও! শুন্ শুন্—ইখানে শুন্। এ ই ছো-করা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচজনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল! সে চার-পাচ জনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি স্বরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শূয়ার-কি-বাচ্চা!

তারপর সে বাড়ির ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভাল অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া; খাটো ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কতকগুলি গুগলি শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে, কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল—মা!

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস না মা? হামি পশুপতি! কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ' কারগুলি সব কেমন শিষের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি ? পশু ? পশো ? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে পশো, পশুপতি ? লম্বা, রোগা, দুরন্ত পনের বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পালাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে—সেই পশুপতি ? পশো ?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস না মা ?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না; পরনে অদ্ভুত পোষাক—সায়েবদের পোষাকও সে দেখিয়াছে—এ পোষাক সেই ধরণের হইলেও ঠিক তেমন নয়। নীলবর্ণ এ এক অদ্ভুত পোযাক। জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রং, নির্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া যাহার সর্বাঙ্গ চুলকনায় ভরিয়া থাকিত, সেই পশুপতি—পশো ? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলি আইবুড় মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব—এই কি সেই ?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুৎ মুল্লুক ঘুরে এলম, মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলাম।

সে আবার সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের কিশোর একখানি মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো! ঠোঁটের কোণ দুইটার ঠিক তেমনিই নীচের দিকে টান! ভুরু দুইটা তো তেমনি মোটা!

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢঢা কাঁহা—শূয়ার-কি-বাচ্চা ?

বুঢঢা—বিপিন জেলে—এই বাড়ির মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা—আমাকেও মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে গেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে বেটী দিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢঢা, শুয়ার-কি-বাচ্চা ?

দশ বৎসর পূর্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্বোধ জেলের ছেলে, সৎ-বাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে—এ অঞ্চলের ভাল ভাল পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত, পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত। জলের তলায় কোন কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত। পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত—কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাট-সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত।

সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানিনা এই বিদেশবাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়! তাহার এটা ওটা কাজকর্ম করিয়া দিত, এটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাহার রথ, সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন, লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়। মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ লোকে টানিলেও সে রথ চলে না। তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীল বর্ণ জল, সমুদ্রের নাকি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া সন্ধান পাইল ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি। ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্দ্ধমান তখন পার হইয়া গিয়াছে। হাওড়ায় পৌছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা হাওড়ায় রেলকর্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে, রেলকর্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনেস্টবলের হাতে। কিল, চড় ও কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনেস্টবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েক দিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা

গাড়ীতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্যের কথা, অতিক্রুত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোন দিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই।

যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না। অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল সে বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট শহর—বড় বড় বাড়ি—অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে সে পথ আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ী—গাড়ী আর গাড়ী, মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল সে হারাইয়া গিয়াছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে সে পথ আর বাহির করা যাইবে না—তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল। মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তার পর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপরও বড় বড় বাড়ি ভাসিতেছে। বাড়ি নয়—জাহাজ। আশপাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল, ও-গুলা জাহাজ। বড় বড় মই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে। আকাশের উপরে একটা মই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝাগুলাকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা—মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কি ভীষণ ধোঁয়ার রাশি। অদ্ভুত লাগিয়া গেল পশুপতির। জায়গাটায় নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোষাক। খাটো মাথার সায়েবগুলার ছোট ছোট চোখ, খ্যাঁদা নাক—পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল—উহারা জাপানী সায়েব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছু দিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলা জিনিস টানিয়া তোলে ও-গুলা—'কেরেন'। জাহাজের গোল চোঙগুলা চিম্‌নী! জাহাজের উপরের ঘরগুলি কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরেও সে দেখিল; সেদিন সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারি পাশে রেলিং-ঘেরা পিছল সিঁড়ি নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে, মধ্যে ঝকঝকে বিরাট যন্ত্রপাতি। সে কি উত্তাপ—আর সে কি শব্দ।

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত। সেখানে কত লোক, কত জাতি, চীনাম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী, মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চারজনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে প্রথম প্রথম খাইয়াছে। বড় হইয়া অবশ্য সেও কত জনকে প্রহার দিয়াছে। কত গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত। পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক্ নাই, শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের মধ্যে আশে পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সারি দাঁত, মধ্যে মধ্যে নাকি তিমিও দেখা যায়। আর ঝড়—আকাশভরা কাল মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে, সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া যায়, কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। 'কালাপানি' আর 'মাডারিনে' (মেডিটেরিনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসীদের সঙ্গেই জাহাজের আপিসে নাম লেখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কতবার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কতবার গিয়াছে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে।

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে—কেমন করিয়া জানি না মনে পড়িয়াছে মাকে, গাঁকে, সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্মরাজতলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোষাক। সে নিজে এক বোতল পাকি মদ আনিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—

সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—জ্ঞাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ! তাহারা মজলিসে গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই।

—বল। বল।

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহদুর।

—নিচ্চয়! একশো বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ ঠিক কথা!

—তো বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক। বটে!

—তা পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে—

এক জন বলিল—আরও দশ টাকা লাগবে। তা না দিলে—যাবে, উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রূপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তারপর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল—দেশ দেশান্তরের লৌকিক-অলৌকিক। একবার একজন আরব দেশের সেখকে তাহারা সমদ্র হইতে তুলিয়াছিল! বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা এই ভেসে উঠছে—ব্যস্, ফিন্ ডুব যাচ্ছে। তিনবার-চারবার। তখুন সারং বললো—নামাও বোট! নৌকো! নৌকো! বোট হল নৌকো। বাপরে, সিখানে কি হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন কিলবিল করছে হাঙ্গর। তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা!

মজলিসসুদ্ধ মেয়েপুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললম রে ভাই তখুন বলব কি, তাজ্জব কি

বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজসুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জ্ঞেয়ান হল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী, দরিয়াওমে গিরলে ক্যায়সে। আদমীঠো বললো, আরবী সেখ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বাই যাচ্ছিলো। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুন্দরে। বললো কি জানিস? বললো—পড়লো তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বললো—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে—মৎ কাটো হামকো। ব্যস, হাঙ্গর ছুঁতে পারলে না। তার পর তো ভাই, সারং তার করলো—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন্ খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশো মাইল চলা গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তারপর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে। পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস্ দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভাল নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা আলো কতো—আসবাব কি, বাজনা কি—আঃ হায়-হায়! সুদূর দেশের আলোকোজ্জল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে হায় হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল —দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ-হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া এক জনকে দিয়া সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়েদের দল। পশুপতি ব্যবধানের সেইখানি জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে, আয়—উঠে আয়!

মজলিসে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

পশুপতি মত্ত দৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তন্বী তরুণী।

মজলিসে ভীষণ হৈ-চৈ উঠিল ; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়া দিল ।—মেরেই ফেলাব শালাকে ।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল । সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না । ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও বলছি । অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই ।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে ।

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল । সে বলিল—ব্যস, মাৎ চিল্লাও, সাঙা করব হামি । ই বাত আছে—কসুর হইছে, সাঙা করব হামি ।

তন্বী তরুণী মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী । জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না । পর দিন সুস্থ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফশোষ করিল না । জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবে একটু উচ্ছলা, কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত । কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর ।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল । উ মেয়ে সর্বনেশে মেয়ে বাবা । বেউলো রাঁড়ী, তিন বার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে ; উ হবে না বাবা ।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিন বার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে । প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে । দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে—ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায় । তার পর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই । বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতেরো-আঠারো বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান । মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল । নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না । জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল ; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল । তারপর একবার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় । পর মুহূর্তে যে ডুবিল আর উঠিল না ।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন। তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভাল লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে নবীনের বাড়ি গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি-করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়িতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্ত দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ করেছিস ?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস ? মান্‌সো ?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

—তু মদ খাস ? মদ ?

এবার মেয়েটি যে দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত প্রবল আকাঙ্খায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল—একখানা ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে সুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারী হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক করো দিন।

সাত দিন পর দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অল্‌রাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জন একটা গলির ভিতর কে ডাকিল—শোন।

রমাদাসী! সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না। সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ- আমি এনেছি তোমার লেগে। একদিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই কি অসুখ করেছিল একদিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সুতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে লয়, রণে বনে অরুণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

ইহার পর পশুপতির সন্ধানই নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জেলেপাড়ার একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্তে। পশুপতির নিরুদ্দেশের কিছুদিন পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল। আমি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল, কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এই—যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা শুনিলাম আরও মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিয়ো অপিসে একটি ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য করে দিলে তোমাদের।

—মানে?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে। মধ্যে মধ্যে কমলদাদার কথা ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম—সেলারের পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি। সেও আমাকে চিনিল—বাবু!

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন?

—আজ্ঞে খিদিরপুরে গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল, আমোদ-টামোদ করলাম রেতে; কি হয়ে গেল, মনে হল কি হবে বিয়ে করে? ত্মাশ বিত্মাশে কত—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনীদের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়, সুতরাং তাহার দোষ কি? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তু ভুল হইছিল, মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হত? রমাদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না আমি বাঁচলাম! আর-

পশুপতি বলিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ, দুরন্ত আঘাত, ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার! কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল, কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়াছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা তত দিন হামারা কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে-মূর্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন-শোন !

—কি করবি এখন ?

পিছনে গঙ্গায় ষ্টীমারের তীব্র সার্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন-শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজের সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তার পর বলিল— লতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারী আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল।

যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই আমার নজরে পড়িল --বিবর্ণ সূতায় বাঁধা সেটা একটা তামার কবচ !

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

বর্তমান কথা সে মহাভারতের কথা নয়, নব ভারতের কথা। এক দিকে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠন আর এক দিকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যে ভারতে হচ্ছে, সেই ভারতের কথা।'

ভূতত্ত্ববিৎ এবং মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার মুখের চুরুটটি নামিয়ে রেখে বেশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন—চেষ্টা করলেন নৈমিষারণ্যে মহাভারতবক্তা সৌতির মতই মুখভাবকে পবিত্র এবং দৃষ্টিকে স্বপ্নপ্রবণ করে তুলতে।

এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম, বিদগ্ধ জনেদের মধ্যেও যিনি নাকি বকের মধ্যে হংসতুল্য বিদগ্ধ, যাঁর নাসা উচ্চ, ওষ্ঠ বক্র, বাক্‌বিস্তারভঙ্গী তীর্যক এবং তীক্ষ্ণ, যাঁর দুটি চোখের একটি অহরহই কৌতুকে চঞ্চল এবং অপরটি উজ্জ্বল, মনেপ্রাণে বিজ্ঞানবাদী, বিলেতে-পাস মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার সেই অমল চৌধুরীর নাকি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন এমন যে, দেখে পুরানো মানুষটিকে নাকি চেনবার উপায় নেই। লম্বা একটা পর্যটন সেরে এসেছে সম্প্রতি এবং সেই থেকেই এমনটা ঘটেছে। শুনেছিলাম অনেকের কাছেই, কারুর সঙ্গে নাকি দেখাও বিশেষ করে না। অবশেষে একদিন কৌতূহলী হয়ে নিজেই গেলাম। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। শীর্ণ হয়ে গেছে অমল। দীর্ঘ পথশ্রমের চিহ্ন তো বটেই, তার উপরেও যেন কিছু আছে। পরিবর্তন বাইরে থেকে সত্যই সুস্পষ্ট। আমি সরাসরিই প্রশ্ন করলাম। অমল হাসলে। এ হাসিও তার মুখে নূতন। কিন্তু এতক্ষণে এই কথাগুলি শুনে আশ্বস্ত হলাম! বাক্‌ভঙ্গীর বক্র বিস্তার-গতি এবং তীক্ষ্ণমুখিত্ব ঠিকই আছে; বসবার ভঙ্গীতে তার অভিনয় প্রচেষ্টাতেও পুরনো অমল চৌধুরী ফিরে এসেছে।

পরিবর্তনের কথাসূত্রেই কথাগুলি অমল বলছিল। সে স্বীকার করলে, একটা পরিবর্তন তার হয়েছে। তার মন বুদ্ধি বিদ্যা সমস্ত কিছুর উপর একটা ঘটনার এমন প্রবল প্রভাব পড়েছে যে, এ পরিবর্তন তার অবশ্যম্ভাবী। একে অতিক্রম করার তার সাধ্য নেই। বললে, আমি ভাবছি। বসে বসে ভাবি, ধ্যান করি - বললে আশ্চর্য হয়ো না যেন। ধ্যান করি।

বললাম, বল কি ? তা হলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় কি ? তুমি ধ্যান কর ? কার ?

অমল বললে, আগে শোন। অন্ত কাউকে এ ঘটনার কথা বলি নি। তুমি সাহিত্যিক বলে বলছি। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। এ ধ্যান কারও ধ্যান নয়, কিছুর ধ্যান। বলেই শুরু করলে, ভারতের ধ্যান, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আশ্বস্ত হলাম তার বাক্‌ভঙ্গী শুনে।

অমল বললে, আগে শোন। তারপর হেসো। তোমার ঠোঁট দুটিতে চাপা হাসি খেলা করছে আমি দেখতে পাচ্ছি। জান বোধ হয়, দামোদর-ভ্যালি প্রজেক্টের একটা আশঙ্কা আছে। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে—ভাল এবং মন্দ, আশা এবং আশঙ্কা। মন্দ ফলের আশঙ্কার একটা হল দামোদর এবং তার সঙ্গে ছোট বড় নদীকে বাঁধ দিলে খনি-অঞ্চলে খনির ভিতরে জলের চাপ বাড়বে, যার ফলে, অনেক খনি হয়তো কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে। সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঘুরছিলাম। মোটা মাইনে পাই, কাজটা মাইনের পরিবর্তে এটা ঠিক। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর যে, আমার আগ্রহ মাইনের বাটখারার ওজন করা চলত না। যদি বল- খাঁটি চাকর, তাই বল। কিন্তু প্রভুদের সর্বতোভাবে মনোরঞ্জন করবার জন্যে বললে, মারামারি করব। কারণ রিপোর্টে খনির মালিকদের সুবিধা করে দিতে কোন মিথ্যা বা কোন অতিরঞ্জন আমি করি নি। একটা অন্ধ সন্ধানের নেশা লেগেছিল আমার।

একখানা সর্বত্রগামী জীপ এবং তার সঙ্গে একটা ট্রলার, তাতে জন তিনেক অনুচর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ওই অঞ্চলে ঘুরছিলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ একদা বাহন অর্থাৎ জীপ ওলটালেন। ছিটকে পড়ে অল্প আঘাত পেয়ে ড্রাইভার, আমি এবং একজন অনুচর ঝেড়েঝুড়ে উঠলাম; কিন্তু বাকী দুজন অনুচর বেশ আঘাত পেলে এবং বাহনও হল অক্ষম – চিৎ হয়ে উল্টে পড়া জীপ সোজা হল কিন্তু তখন তিনি চলচ্ছক্তিহীন।

আদিবাসীদের অঞ্চল। তিন দিকে ঘন অরণ্যে ঘেরা একটা পাহাড়ে জায়গা। ঠিক এই জায়গাটার অরণ্য অবশ্য ক্ষীণ, শুধু শাল মহুয়া পলাশ গাছ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জন্মেছে। একটা একটা পাথুরে টিলা—খানিকটা ঢাল, আবার একটা টিলা, মাঝখানে মাঝখানে ছোট একটা নালা বা কাঁদর; দু পাশের টিলার জল বেয়ে অনেকগুলোতে মিলেমিশে হয় বরাকর বা খুদে বা দামোদর মহারাজের কোন করদ নদীতে গিয়ে পড়ছে। বন যেখানে ঘন, সেখানটা

বোধ হয় মাইল দশেক দূর। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম, অচল বাহনটিকে ঠেলে পিছনে মাইল চারেক নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে নিক ড্রাইভার এবং ওখানেই জখম অনুচর দুজনের চিকিৎসা হোক। আমি ইতিমধ্যে একলাই এ অঞ্চলটা যথাসাধ্য ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে ফেলি। এইভাবে পদব্রজে ঘোরার অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল সে তথ্য অজানা নয় তোমার। এবং এক সময় ডিস্‌পোজালের ডিপোয় ডিপোয় ঘুরে অন্তত পঁচিশটে পঁচিশ রকমের ঝোলাই কিনেছিলাম এমনইভাবে ঘুরব বলে। তেমনই ঝোলা একটা পিঠে বাঁধলাম। বগলে সন্ন্যাসীদের মত ঝুলিয়ে নিলাম ছোট একটা বিছানা। জামার তলায় কোমরে বেঁধে নিলাম আত্মরক্ষার সরঞ্জামের বেল্‌ট্‌—তাতে রইল একটি খোকা আগ্নেয়াস্ত্র, একটা ছোরা, কিছু বুলেট।

সুন্দর দেশ। অরণ্যে ঘেরা অঞ্চল এবং পাহাড়ে আমেজ। ঘন বন যেখানেই পাতলা হয়েছে, সেইখানেই ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছে। আর্য-অভিযানের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দাও। তবে সভ্যতা যত এগিয়ে এসেছে, আদিবাসীরা তত পিছিয়েছে। বনের আড়াল দিয়ে বাস করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলটি যেন অন্য অঞ্চল থেকেও পৃথক। সমস্ত পৃথিবী থেকেই বিচ্ছিন্ন।

ছোট ছোট গ্রাম। ছোট ছোট ঘর। কালো মানুষ। আচারে বন্য। বেশভূষায় আহারে অনেক কিছু এমন আছে যা নাকি বর্বর এবং অস্বাস্থ্যকর আমাদের বিচারে। বসতিগুলি বড় পরিচ্ছন্ন এবং স্বল্প বেশবাস ক্ষারে কাচা পরিষ্কৃত। কিন্তু ঘরগুলি ছোট, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই, সে দিক দিয়ে অস্বাস্থ্যকর। কাঁকুরে মাটির দেওয়ালের উপর শালের রোলা ও বাঁশের কাঠামোয় খড়ের চাল মূল্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। গোবর মাটিতে নিকিয়ে দেওয়ালের প্রলেপে এমন একটি মনোরম স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়—অপরূপ! কারও কারও দেওয়ালের নীচের দিকের ভিতে সুকৌশল আঙুলের টানে ঢেউ খেলানো রেখা টেনেছে, যা দেখে ঠিক মনে হয় তরঙ্গিত নদী; তার ওপরে সারি সারি খেজুরপাতার ঢঙে এঁকেছে গাছ—অর্থাৎ নদীর ধারে আরণ্য শোভা।

মানুষগুলি সরল সহজ এবং কন্ট্রোলের বাজারে ও নানা রোগজর্জর কালেও

স্বাস্থ্যসবল পেশীগুলি এমন দৃঢ় যে মনে হয় পাথুরে ভূমি-প্রকৃতির প্রতিফলন পড়েছে। বনে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে, শালপাতা তৈরি করে, ময়ূর ধরে আনে, খোয়াইয়ের নীচের অংশে চাষ করে। অন্য অঞ্চলে এরা কয়লাখনিতে কয়লা কাটতে যায়, কিন্তু এ অঞ্চলে তেমন লোক চোখে পড়ল না। গায়ে একটা আরণ্য গন্ধ আছে যা কটু লাগে আমাদের। তা থাক। কিন্তু মানুষদের মনগুলি সমতলের মত সরল এবং প্রশস্ত। কুমারী-ভূমির তৃণ-আস্তরণের মতই নরম।

এইখানেই ভয়। যে ভূমি কর্ষিত হয় নি, তার বুকের ঘাসের আস্তরণের মধ্যে চোরাবালি না হোক, চোরা পাঁক থাকে; ঘাসের ভিতরে ফাটল থাকে, অকর্ষিত ভূমির কন্দরে বিবরে সরীসৃপ বাস করে। এদের মন সম্পর্কে তাই আমি সাবধানেই ছিলাম। পা ফেলতাম অত্যন্ত সাবধানে। কোন অন্যায় অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। শুধু লক্ষ্য রাখতাম, ওদের জীবনের কোন নরম জায়গায় পা না দিই। হঠাৎ কিছু বলে না ফেলি। ওদের ভাষাটাও আমি ভাল জানতাম।

তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াতাম দিনের বেলা।

ওরা জিজ্ঞাসা করত, ক্যানে ইসব শুধাইছিস, লিখে লিছিস? কি করবি?

আমি বুঝিয়ে দিতাম। কখনও বুঝবে না বলে উপেক্ষা করতাম না।

একদিন—

অমল চৌধুরী একটু সোজা হয়ে বসল, চুরুটটা তুলে দুটো ব্যর্থ টান দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে,—একদিন সন্ধ্যার মুখে পেলাম একখানি গ্রাম। থমকে দাঁড়ালাম।

খানিকটা দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের ওপাশে আমার ম্যাপে আছে একটা পরিত্যক্ত খাদ দেখা যায়। ওই খাদের লাইন ধরেই সোজা আমি বেরিয়ে যাব। মাইল কয়েক গেলেই পাব দামোদর প্রজেক্টের খাস এলাকা। কাজ চলছে সেখানে। সে কাজ এখান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমার বাহনকে উপদেশ দিয়েছি, পাকা সড়কে মাইল তিরিশেক ঘুরপথ দিয়ে ওই খাস এলাকায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। ওদিকে এই গ্রাম থেকে যেতে হলে ছোট একটা টিবির মত পাহাড়, পাহাড় এই অর্থে যে নিম্ন-ভূস্তরের পাথরের একটা স্তর কোন পুরাকালে কোন ভূকম্পনের বেগে উপরের স্তর-গুলোকে ঠেলে খুদে বিন্ধ্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার ওপাশেই

সেই পরিত্যক্ত খাদটা।

পরিত্যক্ত খাদটার পরেই পাব একটি চালু খাদ। ইচ্ছা ছিল, সেখান পর্যন্তই কোন রকমে যাব। গেলে, আহার বিহার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারব। কিন্তু পথেই অনেক রাত্রি হয়ে গেল। বন্য জন্তুরও ভয় আছে, তার উপর আছে ওই পড়ো খানাটা। কোথাকার কোন গহ্বর কোথায় আছে, কে জানে! অগত্যা একখানা গ্রাম পেয়ে দাঁড়ালাম।

আদিবাসীদের ছোট্ট গ্রাম। সন্ধ্যার মুখ। সঠিক এবং স্পষ্ট সব কিছু দৃষ্টিগোচর হল না। তবে মনে হল, এ গ্রামটি যেন কিছু স্বতন্ত্র, এবং বিশিষ্ট। দেওয়ালের চিত্ররেখাগুলি শিল্পরীতিতে উন্নত। কয়েকটা ঘরের উঠানে দেখলাম মাটির পুতুল, মাটির পাত্র। চাক, অর্থাৎ কুম্ভকারের চাকও দেখলাম। প্রশ্ন জাগল মনে। এরা কি আদিবাসী নয়? কিন্তু মুলতুবী থাকল প্রশ্নটা। আপাতত আশ্রয়ের প্রশ্নটা বড়, এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, যারা নাকি সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে পথ চলতে না পেরে নীচের স্তরে পড়ে গিয়েছে, তাদের কোন্ জাতি, কি পেশা জিজ্ঞাসা করলে তারা পুরাতন ক্ষতস্থানে নূতন করে আঘাত পায়। কোন উচ্চ স্তরের অতিথি এ প্রশ্ন করলেই তাদের মনে সংশয় জাগে, ঘৃণা বা অবজ্ঞা করছে হয়তো।

গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলাম। মোড়ল সমাদর করে আশ্রয় দিলে। এ সমাদরও যেন বিশেষ ও স্বতন্ত্র। তার ঘরের সামনেই একটি পরিচ্ছন্ন এবং বেশ একটু সম্ভ্রান্ত ধরনের চালা। শাল কাঠের চাল, ষড়দল চারিদিকে, শালকাঠের খুঁটি এবং বাঁশের তৈরি ঝাঁপে ঢাকা মেঝেটি গোবর-মাটিতে পরিচ্ছন্ন তকতকে করে নিকানো। সেইখানে থাকতে দিলে। ওইটি ওদের গ্রামের অতিথিশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির যা বল। মহুয়ার তেলের একটি বড প্রদীপও জ্বেলে দিলে। তকতকে মেঝে আবার ঝাঁটা বুলিয়ে পরিচ্ছন্নতর করে দিলে, তারপর মোড়ল সেই স্থানটির উপর হাত রেখে বললে, অতিথ মহাশয়, এইখানে তুমি ঠাঁই নিয়ে বাস কর। অর্থাৎ উপবেশন কর। ঘন করে জাল দেওয়া অনেকটা মহিষের দুধ চিঁড়ে গুড় এনে দিলে। হাতজোড় করে বললে, চিনি তো দেশে হরেছে অতিথ মহাশয়, আর আমরা চিনি খাইও না। গুড় কি তুমি খেতে পারবে?

চিনি আমার সঙ্গে ছিল।

তারপর গল্প করলে। এরই মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে বুঝলাম, আমার

দৃষ্টিতে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। এরা অন্য গ্রামের আদিবাসী থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এদের পেশা মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরি করা এবং কাঠের কাজ করা—কুম্ভকার ও সূত্রধর একাধারে। চাষ অবশ্য আছেই। শিল্পীর গ্রাম। আজ বলে নয়, মোড়ল বললে, সেই দেবতার কাল থেকে এরা শিল্পী।

দেবভাষায়, 'যাবৎ চন্দার্ক মেদিনী' আর কি! অন্য পেশা এদের নাকি নিষিদ্ধ।

তারপর মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, অতিথ মহাশয়, ওই বনে পাহাড়ে কোথা যাবে?

আমি অভ্যাসমত বোঝাতে লাগলাম, দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনার কথা। খ্যাপা দামোদরকে বাঁধা হবে—।

গভীর মনোনিবেশ করে তারা শুনতে লাগল। শুনে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, দেবতা হে! তোমাকে নমো নম।

চমৎকার সে ভঙ্গীটা। উবু হয়ে বসে ছিল, কনুই দুইটি ছিল হাঁটুর উপর, হাত দুটি দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলে করতল দুটি যুক্ত করে প্রণাম জানালে। মাটির দিকেই তাকিয়ে সে এতক্ষণ বোধ হয় আমার কথা শুনে সেগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল। প্রণাম জানাবার জন্যেই মুখ তুললে। মুখ তুলেই প্রণাম শেষে সে সামনের গ্রাম্য পথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, কে? উখানে এমুন করে দাঁড়ায়ে রইছিস গ?

কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে উত্তর দিলে, আমি গ।

—কে? কাঁদন? তু আলি কখন?

—এই আখুনি। ঘরকে আখুনও যাই নাই গ।

—যাস নাই? তা হোথা দাঁড়ায়ে কি করছিস গ?

—দেখছি। উ কে বেটে গ?

—অতিথ বটে। আয়, হেথাকে আয়, বস্। ভাল ছিলিস গ?

—হ্যাঁ। ছিলম।

লোকটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল। স্বল্পজ্যোতি প্রদীপের আলো, জ্যোতির মাপে একটা বাতির আলোর বেশি নয়। তাও আমার সামনে চোখে চশমা, বাতির ছটা চশমায় পড়েছে। লোকটি ভাল নজরে এল না। তবে বেশ লম্বা মানুষ—সবল দৃঢ়।

মোড়ল বললে, অতিথ মহাশয়, এই মানুষটা আমার জামাই বটে গ। তুমি যি সব কথা বলছ, উ সি সব ভাল বুঝে। কুঠিতে কুঠিতে খেটে বেড়ায়।

শহর দেখেছে, রেলে চড়িছে, অনেক দেখেছে গ ; কত বারণ করি, আমাদের জাতকর্ম দেবতার আদেশ অমান্য করতে নাই। তা মানে না। তা কী বলব ?

কাঁদন, ওই নামেই মোড়ল ওকে ডেকেছিল, সে চলে গেল, বললে, চললাম আমি গ।

—দেখলে মহাশয়! আমার বেটীটি ভাল, ললাট মন্দ, কি করব ? দেবতার কথা তো মিথ্যা লয় অতিথ। ই হবে। সে হাসলে।

বুঝলাম, সনাতন ভারতের বাণী। কলিশেষে, বুঝেছ না ?

পরদিন সকালে।

আটচল্লিশটা খোপরওয়ালা ব্যাগটা পিঠে বেঁধে, কোমরে পিস্তলের বেল্ট এঁটে বেরুবার সময় মনে হল, এক দিন থেকে যাব। ওই যে চালটা, তার শালকাঠের ষড়দলে বাটালি হাতুড়ির কাজ দেখে বিস্ময় জন্মাল আমার। সবচেয়ে বিস্ময় বোধ করলাম কিসে জান ? চারিদিকের ষড়দল কারুকার্যে ভরা কিন্তু কোথাও লতা নেই, পাতা নেই, ফুল নেই, পাখী নেই, জন্তুজানোয়ার নেই, আছে শুধু মানুষের মুখ—সারি সারি মানুষের মুখ। অবশ্য সবই এক ছাঁচ। যা অবশ্যম্ভাবী আর কি! বোধ হয় ওই একটা মুখই আঁকতে শেখে শিল্পীরা। যাক। সময় নেই। মোড়ল এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে বিদায় নিয়ে বের হলাম। মোড়ল গ্রামের ধার পর্যন্ত এল। হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বললে অপরাধ নিয়ো না অতিথি। দাঁড়িয়ে রইল। আমার বন্দরের কাল শেষ হয়েছে, জল-কয়লা নেওয়া হয়ে গেছে। প্রভাতালোকিত শান্ত সমুদ্রের মত সম্মুখের প্রান্তর ঝলমল করছে। বেরিয়ে পড়লাম, পেছনে তাকাবার অবকাশ ছিল না এমন নয়, আসলে তাগিদ ছিল না। তবে মনে মনে কল্যাণ কামনা করেছিলাম। এবং ভেবেছিলাম, নতুন কালের ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ সভা রোটারী ক্লাবের পোশাকের খসখসানি এবং পেরালা পিরিচ ও গ্লাসের টুং-টাং শব্দের পটভূমিতে সভাপতির হাতুড়ির শব্দনিয়ন্ত্রিত সমাবেশের মধ্যে এদের সম্পর্কে একটি তত্ত্বমূলক বক্তৃতা দেব। জনহিতকামী অভিজাত গুণীবর্গকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিন্তান্বিত করে তুলব। তাতে এদেরও কিছু হবে এবং দেশের নৃতত্ত্ববিৎ এবং সভ্যতার ইতিহাস-সন্ধানীরাও কিছু খোরাক পাবেন। সঙ্গে অমল চৌধুরীও কিছু পাবে। কাগজে নাম, হয়তো বা ছবিও বেরিয়ে যাবে।

একটু বক্র হাসি অমল চৌধুরীর মার্জিত মুখের পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল। তারপর আবার শুরু করলে, হঠাৎ—

অমল চৌধুরী যা বলতে যাচ্ছিল, সেই ছবি যেন চোখে দেখতে পেলে সে। একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তার আকৃতিতে, কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায় - সমস্ত কিছুতে। সোজা হয়ে বসল সে। তার বসবার ভঙ্গীর মধ্যে যে বিদগ্ধসম্মত ঈষৎ আলসবিলাস ছিল, একটু ঘাড বাঁকানো ভাব ছিল, সেটা অন্তর্হিত হল। কণ্ঠস্বরে অনাসক্তির যে ভানটা ছিল, তাও আর রইল না। কাঁপতে লাগল কণ্ঠস্বর, চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রথমেই বললে, হঠাৎ আমি আক্রান্ত হলাম।

গ্রামটা পার হয়ে খানিকটা এসেই একটি পাহাড়িয়া জোড় বা কাঁদর অর্থাৎ ছোট নদী, সেই নদীর ঘাটের পাশেই একটা বড় পাথরের চাঁই, তারই আড়াল থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষ বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়াল। একেবারে অতর্কিতে, অত্যন্ত অকস্মাৎ। মনে হল, ওই পাথরের চাঁইটা ফাটিয়েই সে বেরিয়ে এল!

আমি চমকে উঠলাম, থমকে দাঁড়ালাম। লম্বা লোকটার চোখে দেখলাম কুটিল আক্রোশ। সে আক্রোশ ক্রোধের অগ্নিশিখা স্পর্শে বারুদের মত বিস্ফোরণোন্মুখ।

চাপা হিংস্র গলায় সে 'আ' অথবা 'হা' ধরনের একটা শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দু পাটি বেরিয়ে পড়ল।

আমি বেল্টে হাত দিতে গেলাম। মুহূর্তে লোকটা হাত চেপে ধরলে, বললে, উখানে তুর গুলি আছে আমি জানি।

লোকটা অনেক জানে আমার সম্পর্কে, কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারলাম না ওকে। আমি ভীরু নই। শুধু পিঠের ব্যাগের চামড়ার বাঁধনে একটু কাবু হয়ে পড়েছি। নিজেকে সংযত করে বললাম, কী চাও তুমি? টাকাকড়ি?

সে বললে, চিনতে পারছিস না? দাঁতগুলি তার আরও বেরিয়ে পড়ল। বলতে লাগল, আমি তুকে কাল সন্জেতে দেখেই চিনলম। এক নজরে চিনে নিলম। হঁ্যা। সা-রা-রা-ত ঘুম হল না। মোড়লের ডরে বুঝাপড়াটা করতে লারলম। ভোরবেলাতে থেকে গাঁয়ের বাহিরে এসে বসে আছি। কুন্ পথে তু যাবি, চল্, কাঁদন যাবে, বুঝাপড়া করবে সে। হঁ্যা। এইবারে কী হয় বল্? আঁ?

খুব যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, তবে ভয় খানিকটা হওয়ার কথা, হয়েছিল। কিন্তু ভাবছিলাম, বোঝাপড়াটা কিসের?

কাঁদন বললে, আখুনও চিনতে লারলি? দেখ দেখি। তার লম্বা চুল সরিয়ে কপালের একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বললে, ই দাগটো মনে পড়ছে না তুর? আঁ? মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল তার।

এবার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। বিস্মৃতি একটা পর্দার মত সরে গেল।—চোখে অণ্ডাল রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফুটে উঠল, প্ল্যাটফর্মের উপরে একজন লম্বা কালো জোয়ান একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে ছুটে চলে আসছে দেখলাম। পিছনে একদল ভদ্রবেশধারী তাকে অনুসরণ করছে। ধর্—ধর।

ওই ডাণ্ডা-হাতে লোকটাই কাঁদন। আমি একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওর কপালে ওই ক্ষতটা করে দিয়েছিলাম। আঘাতে অভিভূত হয়ে কাঁদন তার হাতের লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছিল। কাঁদন শহরে কলিয়ারিতে ঘুরে তার অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। থার্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমে সে একখানা বেঞ্চ দখল করে শুয়ে ছিল। টিকিট ছিল তার গেজলেতে ভরা। একজন বাঙালী ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে এসে বেঞ্চখানি দাবি করেছিলেন। বলেছিলেন, তুই উঠে মেঝেতে শুগে যা।

কাঁদন বলেছিল, তু যা ক্যানে, মাটিতে শুগা!

—আরে! ব্যাটার ছেলের বাড় দেখ দেখি!

—গাল দিস না বলছি।

—আরে, গাল কি দিলাম!

—দিলি না? বুললি না বেটার ছেলে? তু আমার বাবার বাবা নাকি?

অন্যায় ভদ্রলোকের হয়েছিল! এ পর্যন্ত আমরা ওদের পিতার মতই শাসন করেছি, মানুষ করতে চেষ্টা করেছি, পিতৃত্ব দাবি করেছি। হঠাৎ পিতামহত্বের দাবিটা অন্যায় বইকি!

এই নিয়েই বিবাদ শুরু। কাঁদন ওই হলদে টিকিটের টুকরোটুকুর জোরে সমানে তর্ক করেছিল। সে একেবারে পাকা উকিলের মত তর্ক! ভদ্রলোকের পক্ষে জুটে গেলেন অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি; কাঁদনের পক্ষে দু-চারজন জোটে নি এমন নয়, কিন্তু নারী জাতির সম্মানের দাবিও সে যখন উপেক্ষা করলে তখন তারাও তার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করলে।

শায়িত কাঁদন উঠে বসে বলেছিল, বসুক, ওইখানে বসুক

—তুই ওঠ, তবে তো বসবে।

-উঁহু। আমার পাশে বসুক। ওই ছোট মেয়েটা বসুক, তার উপাশে বসুক মাটো। আমি উঠব না! উঁহু!

তখনই যে কেন ব্যাপারটা চরম নাটকীয় মুহূর্তে পৌছয় নি, এইটেই বিস্ময়ের কথা। কিন্তু পৌছয় নি। পৃথিবীতে বিস্ময়ের কথা কিছু নয় বা নেই।

অগত্যাই ছোট মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে বসেছিলেন মহিলাটি। ভদ্রলোক বসেন নি। কিছুক্ষণ চায়ের স্টলে বসে, কিছুক্ষণ পায়চারি করে রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। রাত্রি অবশ্য তখন শেষ, বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে, কাক-কোকিল ডাকছে; কিন্তু যারা সারা রাত্রি জাগে তাদের ঘুমের ঘোরটা তখনই হয়ে উঠে প্রচণ্ড রকমে গাঢ়। ওয়েটিংরুমের আলোটাও ঢুলছিল—দপদপ করছিল। কাঁদন বসেই ঘুমুচ্ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে গিয়েছিল, ওই ন-বছরের মেয়েটির ওপর। ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি এসেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছিলেন কাঁদনের গালে। বর্বর কাঁদন, উদ্ধত কাঁদন! মুহূর্তে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে প্রচণ্ডতর চপেটাঘাত করেছিল ভদ্রলোকের গালে। হৈ-হৈ উঠে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। শুরু হয়ে গিয়েছিল কাঁদন-শাসনপর্ব, চারিদিক থেকে ছুটে এসেছিলেন ভদ্রলোকেরা। ইদানীং নীচের স্পর্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে—এ সম্পর্কে মতভেদ ছিল না। পড়েছিল কিল চড় ঘুষি।

কাঁদন প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল, দিয়েছিলও কিছু কিছু। কিন্তু এত লোকের সঙ্গে সে একা কতক্ষণ লড়বে? সে ছুটে পালিয়েছিল। কিন্তু তাতে নিষ্কৃতি হয় নি, আর্যেরা উদ্ধত অনার্যের অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্যই প্রয়োজন আছে শাসনের। কাঁদন প্ল্যাটফর্মের ওপরে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডাণ্ডাটা। রেলিং-ভাঙা লৌহখণ্ড অথবা এমনই কিছু। সেইটে হাতে তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে পালাচ্ছিল। বন্য মানুষেরা ভয় পেয়ে এইভাবেই পালায়। আমি বিপরীত দিক থেকে ঢুকেছিলাম প্ল্যাটফর্মে। লৌহদণ্ডধারী পলায়নপর একজন লম্বা কালো মানুষের পিছনে অনুসরণরত আর্যদের 'ধর ধর' শব্দ শুনে স্বভাবতই আমি ওকে ভেবেছিলাম, কোন অপরাধী—চোরের চেয়ে বড় রকমের অপরাধী। চোরের লোহার ডাণ্ডা ঘুরোবার মত সাহস অবশিষ্ট থাকে না। বেল্টের পিস্তলটা সঙ্গেই থাকে। সেদিনও ছিল। কিন্তু ওটা বের করেও ছুঁড়ি নি। ওটাকে

বাঁ হাতে ধরে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাঁকও মেরেছিলাম—খবরদার। অব্যর্থ লক্ষ্য বলে আমার অহঙ্কার কোনদিন নেই। পিস্তলেও নেই। ওটা রাখি শব্দ করে, হাঁক মেরে কাজ হাসিলের জন্যে। ঢেলা দিয়ে লক্ষ্যভেদ বাল্যকালের পর কোনদিন করি নি। কিন্তু সেই কাঁদনের ভাগ্যে ছিল দুর্ভোগ, আর তারই জের টেনে এতদিন পরে আমাকে ভুগতে হবে কঠিনতর দুর্ভোগ, তাই বোধ হয় পাথরের টুকরোটা সোজাই গিয়ে লেগেছিল কাঁদনের কপালে। কাঁদন দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কম আঘাত পেত; দুই বিপরীতমুখী গতিবেগ আঘাতটাকে গুরুতর করে তুলেছিল! কাঁদনের মত জোয়ান, লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে বসে পড়েছিল। তারপর আর আমাকে কিছু করতে হয় নি। যা করবার করেছিল দলবদ্ধ জনতা। সে দেখে আমার অনুশোচনার আর সীমা ছিল না। ওকে রক্ষা করবার শক্তিও তখন আমার নেই। আমি ছুটে গেলাম জি. আর. পি তে। সেখানে আমি ছিলাম চিহ্নিত ব্যক্তি। থানার হস্তক্ষেপে কাঁদন রক্ষা পেলে। সেখানেই শুনলাম, অবমানিতা ভদ্রকন্যাটির বয়স সবেমাত্র নয়। এবং অবমাননা, শুনলাম, নিদ্রার মধ্যে ঢলে পড়া। অনুশোচনার আর সীমা ছিল না আমার। ঘোর কৃষ্ণ ললাটে গাঢ় লাল রক্তের ধারা মাথা প্রহারে জর্জরিত দেহ কাঁদন উদাস দৃষ্টিতে থানার ছাদের দিকে চেয়ে ছিল; বোধ করি, দেখতে চেয়েছিল সে আকাশ। আকাশে দেবতা থাকেন। অথবা ওই নীলের মধ্যে হৃদয়স্পর্শী সান্ত্বনা আছে।

আমিই জি. আর. পি কে বলেছিলোম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে। ডাক্তারও আমার চেনা লোক। তাকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম একটা সিরাম ইনজেকশন দেবার জন্যে। বিশেষ যত্ন নিতেও অনুরোধ করেছিলাম। জানি এই আরণ্য মানুষদের সহনশক্তি অপরিমেয়। তবু আমি পণ্ডিত জন, নিজের মতই দেখতে চেয়েছিলাম কাঁদনকে। যদি বল—পাণ্ডিত্যের প্রেরণায় নয়, ওই উদারতাটুকু অপরাধবোধের তাড়নাসম্ভূত, তাতে আপত্তি করব না। বলতে পার। হয় তো তাই সত্য।

কারণ কাঁদন—সেই লোক। অথচ আমি তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্ভবত ওই প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধই কাঁদনের স্মৃতির ওপর একটা আবরণ টেনে

দিয়েছিল। কিন্তু ওই কপালের দাগটা দেখিয়ে ইঙ্গিত করা মাত্র সে আবরণটা সরে গেল। এক মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল।

যে আঘাতে দেহই শুধু আহত হয় না, মর্মও আহত হয়—সে আঘাত মর্মান্তিক। সাংঘাতিক আঘাতে মানুষ মরে, তার স্মৃতির সেইখানেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত মর্মান্তিক হলে তার বেদনা জন্মান্তরেও বহন করে নিয়ে চলে বলে প্রাচীন-সাহিত্যেপুরাণে নজির আছে। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে জরা-ব্যাধের শরাঘাতে মহাভারতের নায়ক যদুপতি বিদ্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য জন্মান্তর আজ প্রশ্নের কথা ; সে আমি বৈজ্ঞানিক হয়ে বলছি না, তবে মর্মান্তিক আঘাত মানুষ জীবনে কখনও ভোলে না, ভুলতে পারে না।

কাঁদন আমার হাতখানা ধরে ছিল, তার মুঠি ক্রমশই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছিল, কালো লম্বা হাতের মোটা শিরাগুলি রক্তের চাপে আরও ফুলে উঠছিল। পেশীগুলি স্ফীত হচ্ছিল, চোখ দুটি যেন ধকধক করে জ্বলছিল অঙ্গারের মত, দাঁতে দাঁত ঘষছিল কাঁদন, নাকের ডগাটা ফুলছিল। কপালে ত্রিশূলচিহ্নের মত তিনটে শিরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। এবার আমি সতর্ক হলাম, শঙ্কা অনুভব না করে পারলাম না। বর্বরজীবনে স্নেহ যেমন গাঢ়, হিংসা তেমনই ভয়ঙ্কর।

নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সংহত করে এবার আমি বললাম, হাত ছাড়।

তখন আমার বৈদগ্ধ্যের খোলস খসে পড়েছে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। কণ্ঠস্বর উত্তেজিত এবং উচ্চ হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার প্রেরণার সঙ্গে অগ্নির সহচর বায়ুর মত হিংসা-প্রবৃত্তিও জেগেছে। কাঁদনের সম্মুখে আমি অন্যায়ের ভূমিতে দাঁড়িয়েও তাকে ন্যায্য শাস্তিদাতা ভাবতে পারছি না। ভাবাছ, আমার শত্রু সে, তাকে আঘাত করবার অধিকার আমার আছে। কোন রকমে পিস্তলে হাত দিতে পারলে কাঁদনকে গুলি করতে দ্বিধা করব না। উচ্চ উত্তেজিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম, হাত ছাড়।

কাঁদন চীৎকার করে উঠল, না।

দেশটা বিচিত্র। অরণ্য এবং টিলার পরিবেষ্টনের মধ্যে তার 'না' উচ্চ শব্দটি উচ্চতর শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। না! এমন প্রতিধ্বনি কদাচিৎ শোনা যায়। বোধ করি, যে স্থানটিতে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সেই স্থানটিই ছিল এমন প্রতিধ্বনি তোলবার কেন্দ্রবিন্দু।

তার পরই সে গম্ভীর ভয়ঙ্কর চাপা গলায় বললে, তুর মাথায় আমি পাথর মারব—এই পাথরটা।

একটা তীক্ষ্ণকোণ পাথর। ওজনে এক পাউণ্ডের বেশি। পাথরটা ছিল তার বাঁ হাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিছনের সেই টিলার উপর থেকে একটা শঙ্কিত উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কাঁদন! ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর; কাঁদন চমকে উঠল।

মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, এ কণ্ঠস্বর গ্রামের মোড়লের।

আবার সেই ডাক ভেসে এল, কাঁদন!

প্রথম ডাকেই কাঁদন চমকে উঠেছিল! এবার সে আমার মুখ থেকে চোখ তুলে আমার পিছনের দিকে—তার সম্মুখের টিলার দিকে তাকালে। এবং ঠিক এক ভাবেই সে তাকিয়ে রইল, যেন স্থির হয়ে গেছে। ভয়ে মুখে চোখে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন খেলে যাচ্ছিল। আগুনের অঙ্গারের ওপর ছাইয়ের আবরণ পড়া দেখেছ? ছাই পড়ে আসে, আবার বাতাসে ছাই উড়ে গিয়ে উজ্জ্বল প্রখর হয়ে ওঠে, আবার ছাই পড়ে; দেখছ? ঠিক সেই রকম। একটা সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব।

মোড়লই বটে।

ছুটে এল প্রৌঢ়। সে হাঁপাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিতে তার সে কি আতঙ্ক, আর তারই সঙ্গে ব্যক্তিত্বময় শাসনের সে কি ইঙ্গিত! সে ঠিক বোঝানো যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, হাত ছাড়্। অতিথের হাত ছাড়্।

উদ্যত আক্রোশ অকস্মাৎ যখন নিরুপায় হয়ে পড়ে, তখন তার অবস্থা হয় বিষদাঁত-ভাঙা সাপের মত। যন্ত্রণায়-ক্ষোভে সে গর্জায়, কিন্তু সে যেন কান্না, উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস!

তেমনিভাবেই কাঁদন বললে, না। আমি ছাড়ব না। না।

—ছাড়্। মোড়ল বললে, হু—ই পাথরটোর দিকে তাকা।

চমকে উঠল কাঁদন।

মোড়ল তাদের নিজের ভাষায় বললে—সে যেন মন্ত্র পাঠ করলে—হুই সাদা পাথরটোর দিকে তাকা। তাকিয়ে থাক্। সাদা পাথরটো কালো হয়ে যেছে, আকাশের নীলবরণ এইবারে তামার বরণ হয়ে উঠবেক; বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ; নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; হুই চারি পাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবেক শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশী বোবা হয়ে যাবেক; তারপর সুরুষ-

ঠাকুরের সোনার বরণ হয়ে যাবে সীসার মতন, আঁ-ধা-র হয়ে যাবে। পৃথিবী—আঁ-ধা-র—

কাঁদন চিৎকার করে উঠল, না না। বলিস না, আর বলিস না, আর বলিস না।

আমার হাত ছেড়ে দিল সে। শুধু তাই নয়, দেখলাম, অকস্মাৎ আগুন নিবে গিয়ে সে যেন অঙ্গারের মত স্তিমিত হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টি শূন্য, হয় খুঁজতে চাইছে দেবতাকে অথবা তার লুটিয়ে পড়া আক্রোশকে। কিন্তু সে নিজেই পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কারুর দিকেই পঙ্গু দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারছে না!

মোড়ল বললে, লে, এইবার অতিথের হাত ধরে বল্—

কাঁদন নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, কি বলতে হবে সে জানত, বললে, আমার মনের পাপ তোমার চরণে দিলাম, তুমি চরণ দিয়ে তাকে মার, আমাকে মুক্তি দাও; আমার বাড়ি চল, আমার মনের মধু তুমি লাও।

মোড়ল আমাকে বললে, ই দিনটি তোমাকে থাকতে হবেক অতিথ, কাঁদনের ঘরে ক্ষীর আর মধুর পায়েস খেতে হবেক। না খেলে কাঁদনের নরক হবেক। গোটা গায়ের সর্বনাশ হবেক। ওই পাহাড়ের মাথায় ওই যে সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবেক। ওই পাথর কালো হলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে উঠবেক। তার পরে বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ।

বলতে লাগল মন্ত্রের মত স্বরে—সেই পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসের সেই বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথাগুলি। কিন্তু আমার কাছে অবিশ্বাস্য হলেও তাদের বিশ্বাসের গাঢ়তায় মোড়লের কণ্ঠস্বরে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে দিক্‌দিগন্তর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

—নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; হুই চারিপাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবে শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশি বোবা হবেক; তার পরে সুরুয-ঠাকুরের সোনার বরণ—

স্বর্ণদীপ্তি জ্যোতির্ময় সবিতা দেবতা পরিণত হবেন নির্বাপিতদীপ্তি মসীময় সীসকপিণ্ডে।

একটা উদ্বেগ আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেললে, আমার বুদ্ধিমার্গী সচেতন

মনের চেতনাও যেন অবলুপ্ত হয়ে আসছিল। আমি বললাম, চল আমি যাচ্ছি।

২

বিচিত্র পদ্ধতি।

আজ জগতে আর্য-অনার্য ভেদটা উঠে গেলেও মুখে না মানলেও ওদের আমাদের বিচারধারাটা স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন আর সংস্কারমুক্ত, বিশ্বাসবাদী আর বুদ্ধিবাদী, যা বলা যাক, দুটি স্তরভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিবাদী মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই ওদের বিচার কিন্তু বিশ্লেষণ করি নি, অবাক হয়ে পদ্ধতির বিচিত্র মাধুর্য শুধু দেখে গিয়েছিলাম।

কাঁদনের বাড়ির সমস্ত দুধটুকু জ্বাল দিয়ে ক্ষীরে পরিণত করে, বন থেকে মধু সংগ্রহ করে এনে পায়স তৈরি করে আমাকে খেতে দিলে।

শান্তশ্রী কৃষ্ণাঙ্গী একটি তরুণী। কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা। আয়ত চোখ, শুভ্র দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে সেদিন বিষণ্ণ মিনতি মিশে একটি অপরূপ মাধুরীর সৃষ্টি করেছিল।

কাঁদন সামনেই বসে ছিল। স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিল সে, যা করণীয় সে-সবই করলে ওই শুচিস্মিতা মেয়েটি। আমার সম্মুখে আহার্যের পাত্র নামিয়ে দিয়ে, সে স্বামীর পাশে গিয়ে বসল। হাতজোড় করে বললে, অতিথ, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের মনের মধু এবং ক্ষীরে পরিতৃপ্ত হও। আমাদের মনের জ্বলন তাতেই দূর হোক।

কাঁদনও কথাগুলি বলছিল তার সঙ্গে, কিন্তু থেমে থেমে। ঠোঁট তার কাঁপছিল। উচ্চারণ যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। বার বার মেয়েটি স্বামীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছিল। মোড়লও দৃষ্টিতে শাসন পরিস্ফুট করে চেয়ে ছিল কাঁদনের দিকে।

আমি বুঝলাম, কাঁদন ক্ষোভকে জয় করতে পারে নি। অথবা প্রাচীন সংস্কারের কাছে সে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না।

তবু আমি বললাম, আমি প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করছি।

মধু এবং ক্ষীর পরিতোষের সামগ্রী, পরিতোষ সহকারে পান করলাম। না করলে ওদের সর্বনাশ হবে, কাঁদনের নরক হবে, গ্রামের সর্বনাশ হবে ; ওই

পাহাড়ের মাথায় সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে ; পাথরখানি কালো হলে আকাশের সুনীল-সুষমা কঠিন তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত হবে ; বাতাস শবগন্ধে পরিপূর্ণ হবে, এমন কি সূর্যদীপ্তিও নিভে যাবে।

ধীরে ধীরে আমার বুদ্ধি চেতনা লাভ করলে।

প্রশ্ন করলাম, অর্থ ?

অর্থ তারা জানে না। তারা জানে, দেবতাকে যে জেনেছিল, যাকে ঘিরে তারা ওই গ্রাম রচনা করেছিল, এ হল তারই আদেশ। সেই মানুষটিই ওই পাহাড়ের উপর ওই সাদা পাথরখানি স্থাপন করে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে শুধু পাথরখানিই রেখে যায় নাই অতিথ। ওই পাথরের উপরে দেবতাকেও বসিয়ে দিয়েছিল। সে দেবতা একদিন চলে গেল। কারা এসেছিল সব, তারা কাঠের মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিলে, পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল। সে দেবতা আর কেউ গড়তে লারলে। ওই দেখ—

দেখালে সে সেই চালা-ঘরের ষড়দল। ষড়দলের গায়ে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে সারি সারি মুখ। রাত্রের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাই নি, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম এক মুখ। ধ্যানমগ্ন মানুষের শান্ত মুখ, কিন্তু মূর্তির মধ্যে কিছু যেন অস্পষ্ট রয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বা কালের জীর্ণতায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে মুখ হয় না! দেবতাকে না জানলে হয় না। মনের হিংসা দেবতার পায়ে না দিতে পারলে হবেক ক্যানে ?

আমরা মাটির পুতুল গড়ি, কাঠের কাজ করি, নক্‌শা আঁকি, কিন্তু দেবতাকে তো আমরা জানি না।

বলতে ইচ্ছা হল, দেবতা নাই। কিন্তু জিভে বেধে গেল।

মোড়ল বললে, দেবতার আদেশ আছে—এই গাঁয়ের লোকে যদি অতিথিকে হিংসে করে, তার উপরে রাগ করে, তবে এমনি করে তার পায়ে হিংসে-রাগ ঢেলে দিয়ে মধু আর ক্ষীরের পায়েস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তার কাছে হাতজোড় করতে হবে। নইলে ওই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে! পাথর কালো হয়ে গেলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে যাবেক—

সেই বিচিত্র বিশ্বাসের কথাগুলি সে আবার বলে গেল, মন্ত্রোচ্চারণের মত। শেষে বললে, ওই পাথর আর বেশিদিন সাদা থাকবে না অতিথ। এই

কাঁদনের মতন মানুষগুলান এখন বেশি জনম লিছে। এই দিন ওই দিনমণি সব-সীসার মত হয়ে যাবেক।

কাঁদন অকস্মাৎ উঠল, উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

শুচিস্মিতা মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, বললে, অতিথ, আমি যাই।

পথের পাশেই পড়ে ওদের সেই পাহাড়টি। গ্রামের ঠিক পরেই।

পাহাড় নয়, একটা বড়গোছের পাথরবহুল টিলা। পূর্বেই বলেছি, কোনও দূর অতীতে কোনও ভূমিকম্পে এখানকার মাটির নীচের পাথরের স্তরটা ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। কালো মরা পাথরের স্তূপটার সর্বোচ্চ স্থানটিতে ওই সাদা পাথরখানি রক্ষিত। একখানি আসন। আশ্চর্য সাদা পাথর। এই ধরনের পাথর—তবে সে পাথর নরম এবং আরও কম সাদা—উড়িষ্যার খণ্ডগিরি-উদয়গিরি অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সে নয়। এ পাথর শক্ত এবং রঙ আরও সাদা। কোথাও একটু মালিন্য নেই। গ্রামের লোকের সযত্নমার্জনায় এতটুকু কলঙ্করেখা পড়তে পায় না, বর্ষার বৃষ্টিতে শ্যাওলা পর্যন্ত ধরে না। মার্জনায় মার্জনায় হাতের স্পর্শে একটি চিক্কণতা ফুটে উঠেছে পালিশের মত। পাহাড়ের মাথায় পরিসরতা দেখে বোঝা যায় যে, এককালে এখানে মন্দিরের মত কিছু ছিল। এখন আছে একটি চত্বর—তার উপরে উঁচু বেদী, তার উপরে ওই আসনখানি স্থাপিত। কালো পাথরের স্তূপের উপর সাদা পাথরখানি একটি শোভার সৃষ্টি করেছে। এর বেশী দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই। হতাশ হয়ে নেমে আসব, দেখলাম, একজন ব্রাহ্মণ উঠে আসছে।

নগ্নগাত্র ব্যক্তিটির উপবীতটি বেশ মোটা এবং সদ্য-পরিষ্কৃত। টিয়াপাখির মত নাক—শুকনাসা, শীর্ণকায়, তামাটে রঙ, লম্বাটে মুখ, ছোট কেশবিরল মাথাটিতে ফুল-বাঁধা একটি টিকি, বিচিত্র গোল চোখ। ব্রাহ্মণ যে ধূর্ত, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। হাতে একটি সাজিও দেখলাম। বুঝলাম, পূজো করতে আসছে।

আমাকে দেখেই ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়াল। গোল চোখ দুটি বহু ভাবনায় ও অনুমানে জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু বোধ হয় কোনো অনুমানে উপনীত হতে না পেরেই সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপুনি?

বললাম, দেখতে এসেছি।

—দেখিতে আসিছেন? কয়লার জায়গা? তা কয়লা ঠাঁইটির নীচে

আছে। এই পাহাড়টি আমার সীমানা। কয়লা ইয়ার তলা পর্যন্ত আছে। উ-পাশেও আছে, তা এমুন ভাইক লেগেছে যে, উখানে কাজ করা আর টাকা জলে ফেলা একই কথা। উঠাঁইগুলান ওই গেরামবাসীর নিষ্কর বটে। স্বত্ব উয়াদের। ই পাহাড়টি আমার। নিবেদন?

আমি হেসে বললাম, না, কয়লার জায়গা দেখতে আমি আসি নি। আমি এই দেবস্থান দেখতে এসেছি।

—দেবোস্থান দেখিতে আসিছেন! বিস্ময় অনুভব করলে সে। তার পরই সে অকস্মাৎ মুখর হয়ে উঠল—মহাপুণ্যস্থান আজ্ঞা। শহর লয়, ঘাট লয়, এই নিজ্জনে মহাপুরুষের সাধনপীঠ। ওই আসনখানি ছুঁয়ে আপুনি যা মানস করবেন, সিদ্ধ হবে। হুই দেখেন, হুই বনের উ-পাশে কালো মেঘের মত দেখিতে পাবেন পরেশনাথ পাহাড়—সমেতশিখর পুণ্যভূমি, ওই স্থানের উপপীঠ। মনের কালিমা কেটে যায়, অক্ষয় মুক্তি হয়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়—

বাধা দিলাম। বললাম, ঠাকুর, মনে কালি আমার যা আছে, সে তোমার ওই কয়লার সিমের মতো। মুছলে যায় না। পোড়ালে ছাই হয়। মুক্তি আমি চাই না। মনের বাসনা আছে, প্রণাম করেও তা পূর্ণ হবে না। তবে, এ কি ঠাকুর, কোন দেবতার স্থান, কি কাহিনী বলতে যদি পার, তবে তোমাকে কিছু দেব আমি।

—হুঁ, আজ্ঞা। বলব আজ্ঞা। এই পূজাটি আমি সেরে লিই। তিন মিনিট, রাম—দুই—তিন। বলেই সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ফুল ফেলতে লাগল। সাজিতেই ছিল একটি ঘটিতে জল। তাও ঢেলে দিলে খানিকটা। ঢিপ করে একটি প্রণাম করে উঠেই বললে, ইখানেই বসবেন বাবু?

—হ্যাঁ। বস।

সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম আমি।

পাশে বসল ব্রাহ্মণ। বললে, দুটা টাকা কিন্তু গরিব বামুনকে দিবেন।

বক্তা বৈজ্ঞানিক সৌভির চোখে আবার স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, আশ্চর্য হে! দীন ধূর্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর একজন মানুষ। সে-ই এ দেশের কথক—বলে গেল চমৎকার ভাষায়। সুন্দর কথকতা।

"পঞ্চ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জৈনধর্ম। সদ্ধর্মেরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সত্যযুগে আদিনাথ ঋষভদেব সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে মহাতপস্যায় জিনত্ব অর্জন করে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যই ধর্ম, সত্য ছাড়া মিথ্যা কথনে, চিন্তনে, কল্পনায় আত্মার পতন হয়। এই ধর্মের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ওই সমেতশিখর আনন্দধামে ভগবান পার্শ্বনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহাপুণ্যভূমি ওই সমেতশিখর। ওখানকার মৃত্তিকা স্পর্শে মানুষ সদভাবনায় ভাবিত হয়, সিদ্ধির পথে খানিকটা অগ্রসর হয়। ওই সমেতশিখরে ভগবান পার্শ্বনাথের যে প্রথম পূজাপীঠ নির্মিত হয়, তাই যিনি নির্মাণ করেছিলেন, মহাশিল্পী তিনি ছিলেন সাধক সন্ন্যাসী। তাঁর এক শিষ্য ছিল এই স্থান তাঁরই সাধনপীঠ। রাজকুলে তাঁর জন্ম। যে মুহূর্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে—মুহূর্তের জন্য তাঁর কপালে সকলে প্রত্যক্ষ করেছিল, চন্দ্রকলার শোভা। কালো ছেলে—কপালে বাঁকা চন্দ্রকলা ভ্রম হয়নি। মুহূর্ত পরেই মিলিয়ে গিয়েছিল। রাণী প্রসব করেই গতাসু হলেন। সেদিন নাকি সমেতশিখরে একটি শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। লোকে বলে, ভক্তের আবির্ভাবে পার্শ্বনাথ পুলকিত হয়েছিলেন।

এই যে অরণ্যভূম—এর নাম আজও পঞ্চকূট—এর মধ্যে চিরদিন বাস করে এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরা। বিক্রমশালী সরল। চারিদিকে দিকহস্তীর মত পর্বতবেষ্টনী, তার পদদেশে ভীমকান্ত অরণ্য-শোভা; বুক চিরে বয়ে গিয়েছে দামোদর-বরাকর নদ; অরণ্যের ভিতরে শার্দূলেরা বিচরণ করে অমিতবিক্রমে। এরই মধ্যে বসবাস করত এই বীর্যবান জাতি। তাদেরই যিনি রাজা তাঁরই ঘরে জন্মালেন এই কুমার। রাণী মারা গেলেন। বিষণ্ণ রাজা মাতৃহারা সদ্যোজাত শিশুটি তুলে দিলেন ধাত্রীর হাতে। এর কিছুকাল আগেই এই রাজ্যে এসেছিল একজন বিদেশী। লোকটি বিদেশী কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন, তাতে সন্দেহ নাই। নিজের যোগ্যতা সে প্রমাণিত করেছিল।

ব্রাহ্মণ বললে, বাবু মশায়, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয়ই দিতে নাই, প্রশ্রয় তো দূরের কথা। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু রাজা গুণগ্রাহিতার আতিশয্যে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেছিলেন। তাকে এক পদ থেকে উচ্চ পদে, সে পদ থেকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজার যখন পত্নীবিয়োগ হল, তখন ঐ বিদেশীই প্রায় সর্বেসর্বা। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত মন্ত্রী দেখলেন, সুকৌশলে ওই বিদেশী তাঁর কল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এমন যুক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে তাঁর

আদেশ লঙ্ঘন করে নিজের মনোমত কাজ করে যে, তাকে বলাও কিছু যায় না ; উপরন্তু রাজা থেকে অন্য সকলের সমর্থন লাভ করে।

মন্ত্রী বিপদ গণনা করলেন, রাজাকে সতর্ক করেও ফল হয় না, সুতরাং তিনি সবিনয়ে অবসর নিলেন। বাকি সময়টা ইষ্টচিন্তায় কাটিয়ে দেবেন। কাজেই মন্ত্রী হল ওই বিদেশী।

এর পর ?

যা হবার তাই হল। ওই বিদেশী একদিন রাজাকে হত্যা করে রাজপদ গ্রহণ করলে। রাজ্যের মানুষ তখন উন্মত্ত। রাজকর সংগ্রহের অজুহাতে সে তখন মধুকে মাধ্বীতে পরিণত করেছে, তণ্ডুল পচন-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে সুরায়। পুরুষেরা হতচেতন, নারীরা হয়েছে নটী।

বাবু, তখন এ দেশে নারীরা প্রত্যেকেই নৃত্যপটীয়সী ছিল। এই যে বনভূমি, এর মাথার উপরে যখন বর্ষায় ঘন কৃষ্ণ মেঘ নেমে আসত, তখন ওই শাল-অরণ্যে গাঢ় সবুজ পল্লবশীর্ষে সহস্র ইন্দ্রধনু ফুটে উঠত। বাবু, গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘঃ, ওই ঘনঘটাবিস্তৃত মেঘমালা আকাশ-পথে চলত, গাছের মাথায় মাথায় কলাপীরা কলাপ বিস্তার করে নৃত্য করে কেকারব তুলে তাকে সম্বর্ধনা করত। রাজার অন্তঃপুর থেকে দরিদ্রের কুটীর-অঙ্গন পর্যন্ত কুলাঙ্গনারা রঙিন কাপড় পরে মাথার খোঁপায় গুচ্ছ গুচ্ছ গিরিমল্লিকা অর্থাৎ কুরচি ফুলের স্তবক পরে নৃত্য শিক্ষা করত। নাচত। বাবু, এখনও এরা বর্ষায় নাচে আর গান গায়—

এস মেঘ বস মেঘ আমার ভূয়ের শিয়রে
গলে নাম ভিজায়ে হে
টিলা খানা টিকরে
তোমার বরণ আমার কেশে—
যতন করে মাখি হে।

এই নৃত্যপরা কুলাঙ্গনারা তখন নর্তকীতে পরিণত হয়েছে। যেন দামোদরে পাহাড়-ভাঙা বন্যার মত উল্লাস-উচ্ছ্বাসের ঢল নেমেছে। হায়! গিরিচূড়ায় বজ্রাঘাত হয় ; কিন্তু কুলভাঙা গিরিকন্যা নদীর তা দেখবার অবকাশ কোথায় ? রাজা নিহত হলেন। নূতন মন্ত্রী চলল রাজপুত্রের সন্ধানে ! বীজ রাখবে না। কিন্তু রক্ষা করলে তাকে ধাত্রী। সে তাকে বুকে করে ছুটে এল সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী গভীর অন্ধকারে ছেলেটিকে বুকে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

এই পাহাড়ে বাস করতেন ওই সিদ্ধ শিল্পী। তিনি হলেন বিশ্বকর্মা। প্রভুপার্শ্বনাথের মন্দির-মূর্তি নির্মাণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন স্বর্গলোক থেকে। তিনি প্রভু পার্শ্বনাথের মূর্তি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করবার জন্য সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যা করছিলেন। বৃদ্ধ এইখানে আশ্রয় নিয়ে ছেলেটিকে ওই সাধকের হাতে সমর্পণ করে সেই রাত্রেই চোখ বুজলেন।

সন্ন্যাসীবেশী বিশ্বকর্মার হাতে এই শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী তপস্যা করতেন, শিশু চুপ করে বসে দেখত। তিনি স্তবগান করতেন সে শুনত। অহিংসা অক্রোধ সত্য পরমোধর্ম ! এরপর সন্ন্যাসী গেলেন সমেতশিখরে—প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দিরপাদপদ্ম নির্মাণের জন্য, তীর্থঙ্করদের বিগ্রহ নির্মাণের জন্য। শিশু তখন বালক, সেও সঙ্গে গেল। বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন, সে নিরীক্ষণ করে। নিরীক্ষণ মাত্রেই সে আয়ত্ত করে শিল্পকৌশল।

নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হল, বিশ্বকর্মা স্বস্থানে প্রয়াণ করবেন, ছেলেটিকে তিনি ডাকলেন। ছেলেটি তখন যুবক। সর্বাগ্রে বললেন—তাঁর জন্মকথা, তাঁর পরিচয়। শুনেই ছেলেটির চিত্ত মহাবিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে তার সর্বাপেক্ষা সূচীমুখ তীক্ষ্ণধার খোদাইয়ের অস্ত্রটা দিয়ে ওই রাজার বুক বিদ্ধ করে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তযন্ত্রণায় অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

আরও ঘটনা ঘটল।

ছেলেটি স্পর্শ করেছিল এই সাদা পাথরখানি ; ওইখানি বেঁচেছিল—ওই মন্দির নির্মাণের পর। ছেলেটির ইচ্ছা ছিল, ওই পাথরে সে একখানি মনোরম আসন তৈরী করবে এবং তার উপর তার ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করে স্থাপন করবে। দীক্ষা তখন তার হয়ে গিয়েছে। এই সমেতশিখরে এসে স্বপ্নে সে দেখেছে এক মনোহর জ্যোতির্ময় পুরুষকে। নিত্য রাত্রে সেই পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়াতেন।

এই মুহূর্তে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেহে-মস্তিষ্কে সে গভীর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওই যে সাদা পাথরখানি, সেখানিও যেন আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং দগ্ধ বস্তুর মত অঙ্গারবর্ণ ধারণ করলে। কালো হয়ে গেল। ছেলেটির মনে হল, আকাশের সুনীল স্নিগ্ধ সুষমা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাম্রবর্ণে কঠিন হয়ে উঠল আকাশ। শ্বাস নিতে কষ্ট হল তার—শবদাহের গন্ধে বাতাস ভারী এবং কটু হয়ে উঠল ! সমেতশিখর থেকে প্রবাহিত একটি

স্বচ্ছতোয়া ঝরণা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তার জল বিবর্ণ হয়ে গেল, লক্ষ কোটি কৃমিকীটে সে ধারা বিষাক্ত হয়ে উঠল। পর্বতের সানুদেশে সবুজ কোমল পত্র-পুষ্পভরা অরণ্য-শোভা ঝরে গেল। দেখতে পেলে—কোটি কোটি কীটে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে অরণ্য। পাখিরা ডেকে উঠল শকুনের ডাক। তার হাতের বাঁশিটা ফেটে গেল। আকাশের সূর্য, তার জ্যোতি স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হল—জ্যোতির্ময় সূর্য যেন গলিত সীসকপিণ্ডে পরিণত হতে চলেছেন।

চিৎকার করে উঠল সে। মনে মনে সে স্বপ্নদৃষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোথায় তিনি? দেখলে, এক ভয়াল মূর্তি—রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষু, তীক্ষ্ণনখর ক্রূর দুটি শ্বাদন্ত, প্রকট করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—রক্ষা কর! বলে সে গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

—রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। তুমি তোমার ইষ্টদেবতাকে ডাক, যাকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

—তাঁকে যে আমি স্মরণ করতে পারছি না। কল্পনা করতে পারছি না। দেখছি এক ভয়াল মূর্তি।

—সে হিংসা। সিংহাসনে বসলে ওকেই তোমাকে স্থান দিতে হবে তোমার দক্ষিণে। কোষে ঝুলবে অসি। সেই অসি যে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করবে, সেই দক্ষিণ বাহুকে সে অশ্রেয় করবে। তাকে বিদায় কর।

—কি করে করব? সে যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মুখে।

—তপস্যা কর।

—কোন মন্ত্র জপ করব? তুমি বলে দাও।

বিশ্বকর্মা তার হাতে তুলে দিলেন খানিকটা মাটি আর এক টুকরো কাঠ। বললেন, পাথরে কাজ করা সময়সাপেক্ষ। তুমি এই দিয়ে নিত্য একটি করে মূর্তি গঠন করবে। আর ভুলতে চেষ্টা করবে তোমার অন্তরের হিংসাকে। প্রথম তোমার মূর্তিগুলি ওই ভয়াল রূপই গ্রহণ করবে। দিনে দিনে দেখবে পরিবর্তন হচ্ছে। তার রূপ পরিবর্তিত হবে, আর এই যে পাথরখানি—এর এই অঙ্গারবর্ণ ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। তারপর যেদিন তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, হিংসা চিরদিনের মত বিদায় নেবে অন্তর থেকে, সেই দিন—সেই দিন দেখবে, এই পাথরখানি আবার নিষ্কলঙ্ক শুভ্ররূপ ফিরে পেয়েছে। সেই দিন দেবতাকে স্থাপন করবে এই আসনের উপর। তুমি ফিরে যাও সেই

পাহাড়ের উপর। প্রভু পার্শ্বনাথের এই সমেতশিখর—এ হল আনন্দধাম ; এখানে এখন থাকবার তোমার আর অধিকার নেই।

এই সেই পাহাড় বাবু। এখানে আরম্ভ হল এই অভিনব বিচিত্র সাধনা। মন্ত্র নাই, শুধু কাঠের উপর বাটালি হাতুড়ির সাহায্যে মূর্তির পর মূর্তি গঠন। কোনোদিন মাটি নিয়ে মূর্তি গঠন। প্রথম মূর্তি হল ভয়ঙ্কর, ওর অন্তরের সেই হিংসার মতো।

মুখের পর মুখ, মূর্তির পর মূর্তি। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখেন। দেখেন। নিত্য প্রভাতে উঠে প্রথমেই দেখেন এই শিলাসনখানি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টির পর্যবেক্ষণে শিল্পী দেখলেন, হ্যা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এই যে গ্রাম, এই গ্রামের অধিবাসীরাও এই দেশের মানুষ ; ওই রাজকুমারের স্বজাতি, তারাই এসে দিয়ে যেত তাঁকে আহার্য। আর সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখত—এই পাগল শিল্পীর কর্ম।

ক্রমে সেই ভয়াল মূর্তির চিহ্ন আর রইল না। সহজ সুন্দর মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল তাঁর শিল্পের মধ্যে। এদিকে শিলাসনও সাদায় মিশ্রিত ধূসরবর্ণে রূপান্তরিত হল।

সেই দিনই বিচিত্র সংঘটন ঘটল আবার। মূর্তিটি শেষ করে তিনি স্মিতদৃষ্টিতে সেই মূর্তিটিকে দেখলেন। সে যেন একটি রূপবান কুমারের মূর্তি ! ঠিক এই সময় এই পাহাড়ের পাদমূলে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। একজন রাজদূত এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এই দেশের রাজা তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। রাজপুত্রের মূর্তি গড়তে হবে তাঁকে।

শিল্পী মুখ তুললেন না, বললেন, না। আমি যাব না।

—তিনি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

—না—না—না। উষ্ণ হয়ে উঠলেন শিল্পী।

পর-মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে সবিনয়ে বললেন, আমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আমি যাব না।

দূত চলে গেলেন। শিল্পী তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে মনে পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন যেন। ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি দূতকে। সেই রাজার দূত !

পরদিন প্রভাতে এই শিলাসনের কাছে এসে অস্ফুট আর্তনাদ করে

উঠলেন। এ কি হল? ধূসরবর্ণে কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণ যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে। এ কি হল? কেন হল?

তাড়াতাড়ি তিনি মাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন।

এ কি? মূর্তির মধ্যে আবার যেন সেই ক্রূরতার আভাস দেখা দিয়েছে!

আকাশের দিকে তাকালেন। ঈষৎ তাম্রাভা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে সেখানে। বাতাস আবার যেন ভারী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দূর নদীতীরে কোথাও যেন জ্বলেছে একটি চিতা।

হে দেবতা! হে গুরু! এ কি হল? এ কি হল?

রক্ষা কর! হে দেবতা, রক্ষা কর!

আবার অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। আবার এল এক রাজপুরুষ।

—না—না—না। তোমাদের আমি করজোড়ে বলছি, আমাকে নিষ্কৃতি দাও। সাধনায় বিঘ্ন করো না। আমি যাব না। আমি যাব না।

চলে গেল দূত।

শিল্পী আশ্বস্ত হলেন। আঃ, তিনি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই।

আবার তিনি মূর্তি গড়তে লাগলেন। এবার মূর্তি হল আরও ভয়াবহ। শিলাসন আরও কালো হয়ে উঠল।

হে ভগবান! তবে কি—?

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করলেন।

প্রভাতে উঠেই শুনলেন, বনভূমিতে কেউ যেন কাঁদছে। মনে হল, পৃথিবী কাঁদছে। পরক্ষণেই মনে হল, না, তাঁর অন্তর কাঁদছে,—সেই কান্না ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। প্রতিধ্বনি উঠছে। না, তাও তো নয়। এ কান্না যে কোন মানবীর বক্ষবিদীর্ণ-করা শোকবিলাপ। কে? কে কাঁদছে?

কান্না এগিয়ে আসছিল।

এল। মূর্তিমতী শোকের মতো একটি মধ্যবয়সী মেয়ে! কোনোও মা।

—কে মা তুমি? শিল্পী প্রশ্ন করলেন, চোখে তাঁর জল এল।

—আমি? শিল্পী, তুমি দয়া কর, আমার পুত্রের—। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন, বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পর ছুটে গিয়ে দু হাতে টেনে বুকে তুলে নিলেন সেই দারু মূর্তিটি। যে মূর্তিটির গঠনশেষে শিলাসনের ধূসরবর্ণে ফুটেছিল শুভ্রবর্ণের বেশি আভাস, যে মূর্তিটির মুখ দেখে শিল্পী মুগ্ধ হয়েছিল; এক কিশোর কুমারের মুখ ফুটেছিল যে মূর্তিটির মধ্যে।

—এই তো ! এই তো আমার কুমার !

ইনি সেই রাজার রাণী। রাজার ছেলে মুমূর্ষু। তিনি রোগশয্যায় থাকতেই রাজা তাঁর মৃত্যু আশঙ্কা করে শিল্পীকে ডেকেছিলেন, ছেলের একটি মূর্তি গড়িয়ে নেবেন। শিল্পী যান নি। প্রত্যাখ্যান করে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। আজ রাণী ছুটে এসেছেন।

কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে দাও শিল্পী। কুমারশূন্য গৃহে আমি থাকব কি করে ?

কিন্তু হে শিল্পী, তুমি কি সর্বজ্ঞ ? তুমি কি দেবতা ? আমার কুমারের মূর্তি—সুস্থ সুন্দর কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে রেখেছ পুত্র-শোকাতুরার জন্য ? আমাকে দাও। কি নেবে তুমি বল ?

শিল্পীর মনে হল, আকাশ অমৃতময় হয়ে উঠেছে, বাতাসে মধুগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, পাখির গানে গানে—বাঁশির সুর ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তে। পুষ্প শোভায় ভরে উঠেছে সুবিস্তীর্ণ শাল অরণ্য।

চোখ দিয়ে তাঁর নেমে এল অজস্র ধারায় মহানদীর বন্যা। সেই জল পড়তে লাগল এই শিলাসনের উপর। তিনি বললেন, নিয়ে যাও মা, ওই মূর্তি। আর আমাকে মার্জনা করে যাও।

রাণী সে কথায় উত্তর না দিয়ে বললেন, এ কি ? শিল্পী, তুমি কি সত্যই সর্বজ্ঞ ?

ভয়ঙ্কর একটি মূর্তি দেখিয়ে তিনি বললেন, এই তো আমার স্বামীর মূর্তি। চর্মরোগে বীভৎস হয়েছে তাঁর রূপ—ঠিক, ঠিক—সেই রূপ।

—ও মূর্তিও তুমি নিয়ে যাও মা। আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার পুত্র বেঁচে উঠুক ! তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ করুন। কিন্তু তুমি শ্রান্ত। কিছু আহার গ্রহণ করে যাও।

শিল্পী তাঁকে খেতে দিলেন কিছু মধু কিছু দুধ।

রাণী চলে গেলেন। শিল্পী এবার পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে শিলাসনের কাছে এসে দারুখণ্ড নিয়ে বসলেন।

এ কি ! এ কি ! শিশুর মত আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শিল্পী।

শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছে শিলাসন। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র।

তার উপর পড়েছে জ্যোতির্ময় সূর্যের স্বর্ণ-দীপ্তি ! মুহূর্তে অন্তর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, যিনি স্বপ্নে তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রভু পার্শ্বনাথ।

৩

অমল চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। আমিও স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। কোনোও প্রশ্ন করতে পারলাম না। একটা প্রগাঢ় ভাবানুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ রেখেই অমল কথা বলে উঠল। একটি প্রসন্ন মাধুর্যময় হাসি তার মুখে ফুটে উঠেছে। সে আবার আরম্ভ করলে, ব্রাহ্মণ কাহিনী যখন শেষ করলে, তখন আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। সেই বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এই বিচিত্র কাহিনী শুনে আমি সমাহিত অবস্থার আস্বাদন পেয়েছিলাম সেদিন। চারিদিকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকিত শালবন, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে দূরান্তে গাঢ় নীল পঞ্চকূট শৈলমালা; পাখির কলকাকলী ছাড়া শব্দ নেই, সম্মুখে সেই শুভ্রবর্ণ শিলাসন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে কথক ব্রাহ্মণ আমাকে বলছিলেন এই বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস যার নাগাল পায় না, বুদ্ধি যাকে বিশ্লেষণ করেও মিথ্যা বলতে পারে না।

কি করে বলতে পারে? কে বলতে পারে? বুদ্ধির অহঙ্কার আমি রাখি। আমি তো কোনো অহঙ্কারেই একে মিথ্যা বলতে পারব না। সেই দিনই যে কাঁদনের ঘরে ওই গ্রামের সকলের সম্মুখে আমি ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির হাতে মধু এবং ক্ষীর পান করে এসেছি। সে পরিতৃপ্তি যে আমার সর্ব অন্তর আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কি করে পারব মিথ্যা বলতে? ওটাকে যদি পূর্ণ সত্য নাও বল, বিকৃত সত্য তো বলতেই হবে। অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষের মতো সত্য। মাটি খুঁড়ে ইটের স্তূপ পেলে অতীতকালের মহানগরীর অস্তিত্বের সত্য যেখানে প্রমাণিত হয়, সেখানে এই মধু-ক্ষীরের সত্যই বা এটাকে সত্য প্রমাণিত করবে না কেন? এই বিচিত্র সাধনাকে যে এরা অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাসে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত রেখেছে, পালন করে আসছে—এ তো মিথ্যা নয়। বিচিত্র সরল মানুষ, সভ্যতার বিবর্তণের বিপ্লবের মধ্যেও এই সাধনাকে এরা ছাড়ে নি। এরা তো মিথ্যাচারী নয়। এরা সেই বিচিত্র ভারতের মাটির মানুষ, যারা ভারতের সকল ধর্মের সকল সভ্যতার কিছু-না-কিছু পরিচয় বহন করে চলেছে। ভারতের আত্মার পরিচয়ের শিলালিপি এদের অন্তরেই তো আছে।

ওই ব্রাহ্মণ হল কুলধর্মে তান্ত্রিক—ঘরে ঘোরতর মাংসাশী, অথচ এই পীঠের

সেবায়েত; এবং ভূখণ্ডের উর্ধ্ব অধঃ সর্বস্বত্বের মালিক। এই ব্রাহ্মণই ওদের পুরোহিত। বোঝ—যোগাযোগ—সমন্বয়।

এই ভাবনার ধ্যান ভঙ্গ করলে বক্তা ব্রাহ্মণ।

অমল এতক্ষণে চোখ খুললে। হাসলে—তার সেই অভ্যাস-করা বক্রহাসি হাসতে চেষ্টা করল। বললে, এতক্ষণের ওই বিচিত্র কথক ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ তার সেই ধূর্ত বিষয়ীরূপে ফিরে ধ্যান ভঙ্গ করে। বললে, বেলা গড়ায়ে গেল বাবু মহাশয়। বলেই হাতখানি পেতে নিবেদন করলে, আপনকাদের হাত ঝাড়লে সে আমাদের কাছে পর্বত।

তার কথকতা অত্যন্ত ভাল লেগেছিল, একখানি পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিলাম। মুখর হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ। এই গণতন্ত্রের যুগে, যখন নিজাম থেকে কোচবিহার পর্যন্ত রাজারা সিংহাসন থেকে নেমে নীরবে সরে দাঁড়ালেন, সেই যুগে আমাকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করলে বার বার। তারপর চেপে বসল। বেলা গিয়েছে বলে বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি এবার চেপে বসল, আইনের পরামর্শের জন্য। টিপিটার ওপাশে যে সাহেব কোম্পানির পরিত্যক্ত খাদ, সেই খাদের জন্য এই টিপিটার সংলগ্ন খানিকটা জমি তারা ব্রাহ্মণের কাছে বন্দোবস্ত নিয়েছিল। এখন তারা পিলার কাটিং করে খাদ বন্ধ করে চলে গেছে। মিনিমাম রয়াল্‌টিও দেয় না। এবং ব্রাহ্মণ বলে যে, কোম্পানি বিনা বন্দোবস্তে এই টিপিটার তলদেশও নাকি শূন্য করে দিয়ে গেছে। তার ক্ষতিপূরণও তার প্রাপ্য। এই নিয়ে সে মামলা করেছে বা করবে। কিন্তু কোম্পানি দেশ স্বাধীন হবার পর তল্পি গুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। আইন-সম্মত সবই সে করেছে—তবু আমার মত বিদগ্ধ ব্যক্তি, যার আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আমেরিকান লটবহরের ষ্ট্র্যাপবন্ধন, মুখে চুরুট, তার কাছে কিছু উপদেশ সে পেতে চায়।

যথাজ্ঞান উপদেশ দিতে হল। ব্রাহ্মণ বিদায় হল। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ। অপরাহ্ণ প্রসন্ন বার্ধক্যের মতো পরিব্যাপ্ত হচ্ছে অরণ্যভূমে। রোদে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে।

পাখিরা কলরব করে উঠল। দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম শেষ করে আকাশে পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ল। কয়েকটি কেকাধ্বনিও শুনতে পেলাম।

আমি বসেই রইলাম। যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর উঠে চারিদিক ঘুরে দেখলাম। যদি সেই মহাশিল্পীর গড়া এব দারুমূর্তির অবশেষ পাই! পাব না জানতাম। শুধু তো কালের ধ্বংস নয়, মানুষও একে ধ্বংস করেছিল। এক সময় এসেছিল এখানে পৌত্তলিকতা-ধ্বংসের অভিযান। অশ্বক্ষুরে এখানকার ধুলো আকাশে তুলে ভেঙে-চুরে আগুন লাগিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করেছিল। করেওছিল। শুধু পড়ে ছিল ওই আসনখানি। যে শেষ বিগ্রহ শিল্পী নির্মাণ করেছিল, তাকে ভেঙে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে তারা চলে গিয়েছিল, ওই পাথরখানার দিকে তারা ফিরে তাকায় নি। শুধু সেইখানিই আছে কালো পাথরের ঢিপির উপর তার শুভ্র রূপ নিয়ে। কিছু পেলাম না। অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম। মনে হল, ওই ওদের চালাঘরের ষড়দলে—সারি সারি খোদাই মুখের কথা। সেই তো ব্রাহ্মণের কথকতার ইতিহাস। ওদিকে সূর্য নামল পশ্চিম আকাশে। অপরাহ্ণের আলো শাল মহুয়া পলাশের মাথায় পড়ল। পূর্বে দূরে নিবিড় অরণ্যের মাথায় বিচিত্র শোভা ফুটে উঠল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে অরণ্য লক্ষ্য করে উড়ে গেল। বিহঙ্গেরা পাখা বন্ধ করবার জন্য ঘরে ফিরল। আমিও উঠলাম। আমাকেও যেতে হবে। ওপারে এই পোড়ো খাদটার পরেই একটা চালুকুঠিতে ডেরা ফেলব। উঠতেই নজরে পড়ল, একটি মেয়ে অত্যন্ত মন্থর গতিতে—হয় সে খুব ক্লান্ত, নয়, সে খুব বিষন্ন—মাথা হেঁট করে দেহখানিকে যেন কোন-রকমে বহন করে নিয়ে উঠে আসছে। একা।

সম্ভবত সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালতে আসছে। ওই গ্রামের মেয়ে। পরক্ষণেই চিনলাম এ তো সেই কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

নামবার জন্যে পা বাড়িয়েও নড়তে পারলাম না।

মেয়েটি উঠে এসেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে শুচিশুভ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, আমি তোমাদের দেবতার স্থান দেখছি।

সে তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

আচ্ছা, আমি যাই। সন্ধ্যা দেবে বুঝি? প্রদীপ দেবে?

এবার সে বললে, না অতিথ, পেণাম করব! মানত করব। একটু চুপ করে থেকে বললে, মরদ আমার পালিয়ে গেল বাবু।

—পালিয়ে গেছে? কাঁদন?

—হ্যাঁ অতিথ। সি ইসব মানে না। তুমি অতিথ, আজকে রেতে ই-পথে যেয়ো না বাবা। সি যদি লুকায়ে থাকে, তবে—

শিউরে উঠল সে।

আমার অনিষ্ট যদি সে করে, তবে এই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে। আকাশের নীল স্নিগ্ধ সুষমা তাম্রাভ কঠিন হয়ে উঠবে। বাতাস ভরে উঠবে শ্মশানগন্ধে! সূর্য সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে।

আমি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অপলক দৃষ্টিতে সেই শুচিস্মিতা মেয়েটির মুখের দিকে দ্বিধাহীন হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটিও কোন সঙ্কোচ অনুভব করলে না।

কালো আদিবাসীর কন্যা। কিন্তু যেমন শান্ত তার মাধুর্যময় দুটি চোখ, তেমনই একটি মিনতিস্নিগ্ধ শ্রী তার মুখে। ঠোঁট দুটি পাতলা কালো, দাঁত-গুলিতেই তার সর্বোত্তম শ্রী—হাসলে মনে হয় মন জুড়িয়ে গেল, পবিত্র হল। অকস্মাৎ তার চোখ দুটি থেকে দুটি ধারা গড়িয়ে এল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে বললে, বাবা অতিথ, তুমি আমাদের দেবতা। তুমি আশীর্বাদ কর বাবা, যেন তার মতি ফেরে। উয়াকে আমি বিয়া করেছিলাম, বাবার কথা শুনি নাই; গোটা গাঁয়ের লোক উয়ার উপরে নারাজ, তবু আমি মানি নাই। উয়ার এ কি মতি হল বাবা? গাঁয়ের লোক বলছেক, বাবা বলছে—সর্বনাশ হবেক, সি উয়ারই লেগে হবেক। হায় বাবা, সবাই বলছে—উয়ার নরক হবে। ই আমি কি করে সইব বাবা?

কথাগুলি বলতে শুরু করেছিল আমাকে। বলতে বলতে আবেগের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে কখন যে সে শিলাসনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কথাগুলি ওই শিলাসনকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। বুঝলাম, যখন সে কথা শেষ করে নতজানু হল শিলাসনের সম্মুখে, হাত দুটি জোড় করলে, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, আবার তার শান্ত মাধুর্যময় শুভ্র দুটি চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল তখন। নতজানু যুক্তকর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে প্রণত হল। শিলাসনের প্রান্তে মাথাটি রাখলে। আত্মসমর্পণ কখনও চোখে দেখি নি, মনে হল, আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করলাম। দেহখানি তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বুঝলাম কাঁদছে। গভীর বেদনায় মন আমার ভরে উঠল। কিন্তু আর ওখানে থাকতে পারলাম না। মনে হল, থাকা উচিত নয়, থাকার অধিকার নেই আমার।

আমি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম। যখন এপারে একেবারে নেমেছি, তখন ডাক শুনলাম—অতিথি!

ফিরে তাকালাম। শুচিস্মিতা মেয়েটি গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে ডাকছে। আমি হেঁকে বললাম, ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব।

সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি পিস্তলটা খুলে হাতেই নিলাম। কি জানি? তবে কাঁদনকে আমি হত্যা করব না। দরকার হলে—হাত বা পা খোঁড়া করে দেব। মেয়েটি আমার মনের মধ্যেই চিরস্থায়ী একটি আসন যে!

ঠিক এই জন্যেই আবার আমি ফেরার পথে এই পথই ধরলাম। দেখে যাব কাঁদন ফিরল কিনা? কিছু টাকা দিয়ে কাঁদনকে শান্ত করে যাবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল। তা ছাড়া পুলিসের হাঙ্গামা দেখেও ও-পথে যেতে ইচ্ছে হল না। যেখান পর্যন্ত যাবার, দামোদর প্রজেক্টের কাজ যেখানে চলছে, সেখানে ঢুকতেই আমাকে দেহ খানাতল্লাস করতে দিতে হল। বোঝ হাঙ্গামা! সেই আট-চল্লিশ খোপওয়ালা পিঠে-বাঁধা ব্যাগ! তার উপর পিস্তল ছোরা কার্তুজ! লাইসেন্স আছে, পরিচয়পত্র আছে, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সার্টিফিকেটও আছে। কিন্তু পুলিস তো সহজে ছাড়বে না। চোর নই—এ প্রমাণ করতেই অন্তত চার-পাঁচখানা তার পাঠাতে হবে। ভাগ্য ভাল যে দেখা হয়ে গেল বন্ধু-পুলিসের সঙ্গে। মাখনবাবু আই. বি ইন্সপেক্টর। বিদগ্ধ জন। বাংলা সাহিত্যের এম-এ। থিয়েটার-রসিক এবং পাগল জন। তিনি ছিলেন ওই প্রথম ঘাঁটিতে ইন্‌চার্জ। তিনি বাঁচালেন স্ট্র্যাপ খোলায় দায় থেকে। সব শুনে বললেন, এ পথে আর হাঁটবেন না। ওয়েস্ট-বেঙ্গল বেহার—দুই প্রভিন্সের আই. বি জড়ো হয়েছে। পিছনে চাষ চলছে। ব্যাপার জানতে চাইবেন না। বলতে পারব না। আপনার জিপ এসে থাকলে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। যে পথে এসেছেন সেই পথে চলে যান, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র। কারণ এ পথে আরও এগুতে হতেও পারে আমাদের। ব্যাপারটা একটা বড় ব্যাপার।

জিপ আসতেই রওনা হলাম।

মাখনবাবু বললেন, 'যে পথ দিয়ে এসেছিলে তুমি সে পথ দিয়ে ফিরলে নাকো আর'—ব্যাপারটা ভাল না। যে পথে আসা, সেই পথেই ফেরা ভাল। গুড লাক্!

কাপড় ছিঁড়লে যেমন সেলাই করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, যে-কোন

মুহূর্তে আর এক জায়গায় ফাটে, মোটর জাতীয় যন্ত্রগুলির প্রকৃতি ঠিক তাই। একবার জখম হলে তখন মালিশ মেরামত পালিশ যতই কর, আবার যে-কোন মুহূর্তে বার কয়েক উঁ-উঁ শব্দ করে থেমে যাবে। তার ওপর মফস্বলে মেরামত। মাইল পঞ্চাশেক এসেছে—সেই ঢের। হঠাৎ থেমে গেল। গেল সন্ধ্যের মুখে একটা জঙ্গলের ভিতর, পিছনে ঢালু খাদটা—সামনে সেই ব্রাহ্মণের সীমানায় বদ্ধ খাদটা, তার ওপারে সেই শিলাসনের প্রস্তরস্তূপ। ইচ্ছা ছিল, ওই স্তূপটা পার হয়ে সেই গ্রামের এলাকায় ডেরা নেব। এবার আতিথ্য স্বীকারের প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে সঙ্গী আছে, তাঁবু আছে যা পাঁচ মিনিটে খাটানো যায়। খাদ্যদ্রব্য সব আছে। সকালে গ্রামে গিয়ে মোড়লের সঙ্গে দেখা করে কাঁদনের সংবাদ নেব। তাকে কিছু টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করব। এমন কি—

থামলেন বক্তা। একটু হেসে বললেন, আজ আমারও অশোভন মনে হচ্ছে সে চিন্তাটা, তোমাদের তো হবেই। মনে হয়েছিল, নিজের কপালে পাথর ঠুকে রক্তপাত করে কাঁদনের হিংসার উগ্রতাটা কমিয়ে দেব! তার গ্রামের জাতির অনুশাসনে যা বারণ, তা নইলে যে ক্ষেত্রে তার কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আমিই প্রকারান্তরে আদায় দিয়ে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ এবং ক্রোধকে শান্ত করব। অর্থাৎ খানিকটা কপালের রক্ত।

কিন্তু মাঝপথে রথ অচল হল। বন এখানে ঘন না হলেও মন্দ নয়। শাল পলাশ মহুয়া এখানে বেশ সন্নিবদ্ধ হয়ে অরণ্যের গাম্ভীর্যই এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে কুর্চি এবং কাঁটা ঝোপ। কোনো রকমে জিপটাকে ঠেলে পথের পাশে সরিয়ে পথের ধারে গৃহ রচনা করা গেল। কাজের চাপ বেশি ছিল না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। দামোদর প্রজেক্টে—জলের চাপ বাড়বে খানিকটা খনি অঞ্চলে, সে বাড়ুক, কিন্তু যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে জলপ্রপাত-বেগ হতে, তার সাহায্যে সে জল নিষ্কাশন করা কঠিন হবে না। এই যে অঞ্চলটা—এ অঞ্চল পর্যন্ত একটি বিস্তৃত জলাধার তৈরি হবে। এ বন তখন বোধ হয় থাকবে না। কাজেই প্রকৃতির শোভা আর ওই গল্প—শিলাসন আমার মনের মধ্যে অনায়াসে স্থান পেয়েছিল।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, বোধ হয় তিথিতে ছিল একাদশী কি দ্বাদশী, আকাশ ছিল ঘন নীল। ঘনপল্লব সেই ক্ষুদ্র বনভূমির বুকে পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না পড়েছে; সে এক অপূর্ব শোভা! সত্য বলছি,

বেড়াচ্ছিলাম—হঠাৎ দূরে দূরে ওই জ্যোৎস্নার টুকরোগুলি দেখে মনে হল, যেন রত্নালঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে আছে। রামায়ণ মনে পড়ল, সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছেন হরণ করে—তিনি আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছেন তাঁর রত্নালঙ্কার, তার কতক পড়েছে মাটিতে, কতক লেগে রয়েছে বনস্পতির শাখা-পল্লবে। আকাশের দিকে চাইতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাঁদ চোখে পড়ে তো আকাশ চোখে পড়ে না, আকাশের টুকরো চোখে পড়ে তো চাঁদ চোখে পড়ে না! অরণ্যের ভিতরটা থমথম করছে। ডাকছে শুধু অসংখ্য কোটি কীট-পতঙ্গ। সে এক সঙ্গীত। খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে ইচ্ছা হল। ছোট বন, বনের একটা টুকরো—ঘন বন এককালে বিস্তৃত ছিল, এখন কেটে শেষ হয়েছে, এই টুকরোটা পড়ে আছে। কোথাও কাঠঠোকরায় অবিরাম গাছের কাণ্ডে ঠোকরাচ্ছিল। আমার মনে পড়ল সেই শিল্পীর স্মৃতি। মনে হল, কাঠের উপর মূর্তি রচনা করছে বোধ হয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

বেশ খানিকটা গিয়েছি—জায়গাটা প্রায় বনটার এক প্রান্তভাগে ; মানুষের সাড়া পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। কে কোথায়—দেখবার চেষ্টা করলাম। তাদের আবিষ্কার করার পূর্বেই কিন্তু বুঝতে পারলাম, অরণ্যচারী মিথুন ; দুটি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মিনতিভরা মৃদু মিষ্ট নারীকণ্ঠের বাক্যগুলি কানে ঠিক এল না। পরক্ষণেই পেলাম পুরুষকণ্ঠের কথা।

—না না না। কাঁদন যাবে না, সি উসব মানে না, গাঁ থেকে এই টিলা তাকাৎ মাটি মেপে গড়াগড়ি খাবে না। গাঁয়ের সবারই কাছে হাত জোড় সি করবে না। তুর বাবাকে আমি মানি না। না, মানব না।

—বাবাকে মানিস না, ধরমকে, দেবতাকে—

—না—না। কতবার বলব? ও পাথরকে আমি মানি না। আমি দেখাব, সি লোকটার লহু আমি দেখব, রক্ত লিব, দেখাব—পাথর কালো হল না, কিছু হল না। দেখাব আমি।

—না—না, বুলিস না গো, তুর পায়ে পড়ি।

—শুন্, তু যদি আমাকে লিবি তো কালকে রেতে যা পারিস নিয়ে চলে আসবি। আমি তুকে নিয়ে চলে যাব। আর না আসিস তো থাক্। কাঁদন ফিরবে না। মিছে বলে না কাঁদন।

কাঁদন আর তার বউ—সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

কাঁদন সমাজবিধি মানে নি, তাকে গ্রামের লোকের কাছে দ্বারে দ্বারে পাপ স্বীকার করতে হবে, গ্রাম থেকে সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসতে হবে ওই শিলাসন পর্যন্ত, সঙ্গে আসবে তার স্ত্রী জলভরা কুম্ভ মাথায় নিয়ে। তাই দিয়ে ওই শিলাসন ধুয়ে প্রণাম করে মার্জ্জনা চেয়ে বলতে হবে—ক্ষমা কর। আমার পাপ ক্ষমা কর। তুমি শুভ্র থাক, নিষ্কলঙ্ক থাক। কাঁদন সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসবে, সঙ্গে আসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। প্রতিবার চিৎকার করে সমস্বরে বলবে, পাপীকে ক্ষমা কর হে! সে দীনতা, সে অপমান স্বীকার করবে না কাঁদন। সে চলে যাবে গ্রাম থেকে।

—কি বলছিস? বল্? আসব কাল রেতে হেথা? থাকব দাঁড়ায়ে?

—আসব। তুর বড় আমার কে আছে বল্?

আমি এগিয়ে যাব কি না ভাবছিলাম। চিত্তগ্লানির আর সীমা ছিল না। স্থির করলাম, এগিয়ে যাই। কাঁদনের কাছে মার্জনা চাই। তার হাতে একটা পাথর তুলে দিই, বলি—মার্ আমাকে কাঁদন। তোর হিংসা চরিতার্থ হোক। তোর পরিতৃপ্তি হোক।

কিন্তু তার আগেই মোটরের শব্দ উঠল, ভারী মোটরের শব্দ—আমার জিপের নয়, বনের গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটানা শক্তিশালী ইঞ্জিনের গোঙানি বিচিত্রভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। একটা নয়,—দুটো তিনটে চারটে। কি ব্যাপার? এই রাত্রে এতগুলি মোটর?

কাঁদনের গলা কানে এল—পালা তু। ঘরকে যা। পুলিস—পুলিস এসেছে। তু পালা।

একটা দ্রুত পদধ্বনি শুনলাম। এবার দেখতে পেলাম, একটা কুরচি ঝোপের আড়াল থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণকায় কাঁদন অরণ্যচারী শার্দূলের মতো ছুটে পালাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে তাকে দেখা যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আড়াল পড়ছে গাছের কাণ্ডে। সে মিলিয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে উঠল সেই মেয়েটি। চিরবিষণ্ণ উদাসিনী কৃষ্ণ রাত্রির মতো কৃষ্ণকায়া মেয়েটিও চলে গেল শ্রান্ত পদক্ষেপে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। মধ্যে মধ্যে দাঁড়াল। দেখতে চেষ্টা করলে কাঁদনকে। বুঝলাম তার উদ্বেগ।

পুলিস! কিন্তু কাঁদন পালাল কেন?

পুলিস! চকিতে মনে পড়ল, মাখনবাবু আই বি. ইন্সপেক্টরের কথা—এদিকেও হয়তো যেতে হতে পারে।

ওদিকে ঘন ঘন জিপের হর্নের শব্দ উঠছে। আমি দ্রুতপদে ফিরলাম। দেখলাম, আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। আমাদের আস্তানা ঘিরে পুলিস। আমার সঙ্গে পিস্তল ছোরা কার্তুজ। খুলে বসলাম সব পকেটগুলি, দেখাতে লাগলাম —কাগজের পর কাগজ, পরিচয়পত্র। মাইনিং ফেডারেশন, চেম্বার অব কমার্স, মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স, ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র—মায় আমার ফোটো। ইতিমধ্যে এসে পৌছুলেন মাখনবাবু, তিনি হেসে বললেন —কি হল আবার ?

বললাম, জিপ অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা এখন আপনি।

বলতে বলতে আরও দুটো লরি এসে পৌছুল। পুলিস বোঝাই। যিনি আমার কাগজ দেখছিলেন, তিনি এবার হেসে আমাকে রেহাই দিয়ে বললেন —আর এগুবেন না আপনি। সাবধানে থাকবেন। মাখনবাবু, আপনি এখানেই থাকুন।

বুঝলাম, বিশ্বাস করেও পাহারা রেখে গেলেন। আমার জিপ খারাপ, নড়বার উপায়ও ছিল না। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু কাঁদন কি ডাকাত দলের লোক ? এ অঞ্চলে বড় বড় ডাকাতের দল আছে, কুঠি লুঠ করে! কিন্তু আই বি মাখনবাবু—

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনলাম।

মাখনবাবু বললেন—রেড আরম্ভ হয়ে গেল।

ভোরবেলার অরণ্যভূমি মুখরিত হয়ে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের কঠিন উচ্চশব্দে। বহু দূরে দূরে প্রতিধ্বনি উঠছে! টিলার পর টিলা—চারিদিকে অরণ্য— প্রতিধ্বনির দেশ।

মাখনবাবু বললেন—এত বড় যুদ্ধটা গেল। মারণাস্ত্র দিয়ে পাহাড় বানিয়ে গেছে আমেরিকানরা। পানাগড় ডাম্প থেকে চুরি করে প্রচুর অস্ত্র গুলিবারুদ একদল বামপন্থী এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে—খাদের ভিতর। কাল সন্ধ্যায় একজন ধরা পড়েছে, সে কনফেশন করেছে—

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল কোথায়। কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। আমাদের যেন চেতনা হারিয়ে গেল। গাছগুলি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। মাটি কাঁপতে লাগল। ঝরঝর শব্দে ধুলোমাটি ঝরতে লাগল গাছের পত্রপল্লবে। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সম্মুখ ভাগ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিতে মাটিপাথর ধুলো উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়ছে।

আমরা বসে পড়েছিলাম।

প্রথম কথা বললেন মাখনবাবু, বললেন— ধরা গেল না। এক্সপ্লোড করে দিলে। এখানকার পোড়ো খাদের তলায় একটা ডাম্প ছিল। কিন্তু আর না। এগুতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

যেতে হবে!

বন্ধু মাখনবাবু বললেন—সেজন্যে নয়। আসুন। আমারও দায়িত্ব আছে। আপনিও নিরাপদে থাকবেন।

লরি গর্জে উঠল। চলল।

কিছুদূর গিয়ে অরণ্যপ্রান্ত। সামনে সেই টিলা। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই শুভ্র শিলাসনখানি। টিলার ও মাথায় দেখা যাচ্ছে মানুষ, পুলিস।

হঠাৎ আবার শব্দ উঠল।

বিস্ফোরণের নয়। একটা গোঙানি। ভূমিকম্পের সময় গোঙানি শুনেছ? অনেকটা সেই রকম। ভূমিকম্প—গাছ দুলছে, মাটি কাঁপছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, রোখো, রোখো।

ড্রাইভার ভয় পেয়েছিল, সে রুখলে।

বললাম, পিছিয়ে— পিছিয়ে চল।

—কেন? মাখনবাবু প্রশ্ন করলেন। ভূমিকম্প? এ কি? এ কি?

—না। সাবসাইড।

—কি?

—খাদ ধসছে। ভিতরে পিলার কাটিং করে নিয়ে গেছে বণিকের দল। উপযুক্ত, কি আদৌ স্যাণ্ডপ্যাকিং করে নি। প্রচণ্ড এক্সপ্লোশনের ফলে সে ধসছে। নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুক ফাটছে। ওই দেখুন।

ভাগ্যক্রমে আমরা এলাকার বাইরে ছিলাম। সামনে মাটি ফাটল, বসতে লাগল। বড় বড় বনস্পতি দুলতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, তার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ছে—বড় বড় মূল ছিঁড়ছে ঝড়ের জাহাজের কাছির মতো। কাঁপতে কাঁপতে হেলতে লাগল, সশব্দে পড়ল। মাটি বসছে। ভিতর থেকে বদ্ধ বায়ু সশব্দে উঠছে ঘূর্ণাবর্তের মতো। পাথর ছুটছে। সে এক দৃশ্য! একটা যেন খণ্ডপ্রলয়। একটা মহাকালান্তর। বিরূপাক্ষ নাচছে। মাটি বসে গেল।

এ কি?

'এ কিই' বা কেন ? হাসলাম। সেই মহাসাধকের সেই টিলা ফাটছে। এই প্রচণ্ড টানে সেও ধসে পড়ছে। মহাশব্দ করে সে পড়ল। এতে 'এ কি' বলে প্রশ্ন করছি কেন ?

শিলাসন ! শিলাসন গেল, নবযুগের সুড়ঙ্গপথে পৃথিবীর বুকে যে ফাটল ধরল, তারই মধ্যে পাতালগর্ভে চলে গেল !

ও আর কালো হবে না ? ও কালো হলে আকাশ আর তামার বর্ণ ধারণ করবে না ? বাতাসেও উঠবে না শবদাহের গন্ধ ! হারিয়ে গেল, অতীত কালের মতো মুছেই গেল !

যাক। তাতেই বা ক্ষতি কি ?

আছে ক্ষতি। ওই ধসে-পড়া টিলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দলে দলে নরনারী কাঁদছে। বুক চাপড়াচ্ছে বৃদ্ধ মোড়ল।

ও কি ?

ছুটে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। কাঁদনের স্ত্রী, মোড়লের কন্যা।

—দেবতা, ফিরে এস। আমার স্বামীর পাপ ক্ষমা কর।

চিৎকার উঠল চারিদিক থেকে। কিন্তু শুচিস্মিতা শান্ত মেয়েটি আজ উন্মাদিনী। সে ব্যাধ-ভীত হরিণীর মতো লাফ দিয়ে নামল ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। কখন যে বসে যাবে সে-স্তূপ কেউ বলতে পারে না। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কই সে আসন ? কোথায় সে আসন ?

উন্মাদিনীর মত সে খুঁজতে লাগল। তার স্বামীর প্রতি সহস্র মানুষের অনুযোগ সে সহ্য করতে পারবে না। কাঁদনের অনন্ত নীরস পরিণামের কথা ভেবে সেই মহাভারতের যুগের নারী অধীর হয়ে উঠেছে। তার বাপের বুক-চাপড়ানি সে দেখতে পারছে না। ওই পাথর হারিয়ে যাবে, মাটির ভিতরে কখন কলঙ্কে কালো হবে, আকাশ তামার বর্ণ ধরবে, বাতাস শবদাহের গন্ধে ভরে উঠবে, নদীর জল দূষিত হবে, গাছের পত্রপল্লব ঝরে যাবে, কীটে আচ্ছন্ন হবে, জ্যোতির্ময় সূর্য স্তিমিত হয়ে সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে এই মহাভাবনায় সে উন্মাদিনী। সে জানে, কাঁদনই এর কারণ। সে তার প্রিয়তমা। পাপ তার। সে খুঁজছে। শিলাসন—কোথায় শিলাসন ? তুলতে যে তাকে হবেই।

কিন্তু প্রকৃতি কাল নিষ্ঠুর।

মাটি বসছে। উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ধূলার রাশি আকাশ স্পর্শ করলে।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল অমলের। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর আবার বললে, মানুষ কিন্তু প্রকৃতির শক্তির কাছে হার মানে না। মানুষ আশ্চর্য! গোটা গ্রামের মানুষ যারা বুক চাপড়াচ্ছিল, তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠল সে কি বিস্ময়কর দৃঢ়তা, কঠিন পবিত্র সংকল্প! পিঁপড়েরা যেমন ধ্বংস-হওয়া বাসস্থান উদ্ধার করে, তেমনই ভাবে নামল তারা সেই গভীর গহ্বরে। তারপর দীর্ঘ তিন দিন ধরে মাটি পাথর সরিয়ে তুলে আনলে সেই শিলাসন। আশ্চর্য, মেয়েটিই আঁকড়ে ধরে ছিল সেই আসনখানি।

প্রায় অক্ষতই ছিল সে আসনখানি। দুটো একটা টুকরো কোণ থেকে ছেড়ে গিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে সামনের তাক থেকে এক টুকরো সাদা পাথর নামিয়ে নিয়ে তার মাথায় ঠেকালে অমল। বললে, আমি ভাবছি শুধু সেই দেবতার কথা, যে দেবতা এই আসনের উপর ছিলেন, তার কথা। আর ভাবি মূর্তিমতী নিষ্ঠার মতো ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির কথা।

তমসা

ব্রাঞ্চ-লাইনের ছোট একটি স্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির সঙ্গে সমতল প্ল্যাটফর্ম, তাও একটা। প্ল্যাটফর্মের কোলে পয়েন্টিং-করা ছোট একখানি ঘরে স্টেশন রুম, বাকিটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্শেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা—জেনানা।

স্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের স্টল—রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের স্টল। স্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস-শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তর মুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়নবোর্ডের কল্যাণে দু পাশে নালা কাটা হয়েছে—দড়ি ধরে বেশ সোজা লাইনে নয়, সাপের দাগের মত আঁকা-বাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে, গ্রাম্য বাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে—স্টেশন-রোড, ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে। স্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং-অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের স্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শান্টিং লাইন। বাস্, স্টেশন-এরিয়া শেষ। স্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দু পাশে খানকয়েক ঘর—একখানায় পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান, দুখানায় কয়লার ডিপো গদি, একটায় স্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকা বাড়ি। বাড়িটা ফাঁকা। বড় বড় বটগাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ি এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দুটো ট্রেন। এইখানেই ক্রসিং হয়। লোকে বলে—মিট হয়। ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। স্টেশন-শেডের মধ্যে অল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খেমটা নাচের দল—দুটি তরুণী, একটি বুড়ি ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশান-দুরস্ত ছোকরা। সিগারেট মুখে প্ল্যাটফর্মের এ-ধার থেকে ও-ধার পায়চারি করে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিৎ চেহারা। চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত। বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত। পরনে একখানা মোটা সুতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে ছোট করে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বোঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জনকয়েক কুলি স্টেশনে স্টলের কাছে বসে আছে, গল্পগুজব করছে, মধ্যে মধ্যে স্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিবে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ছোকরা শিস দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নাই। এমন কি, তার সঙ্গে তরুণী দুটিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ। সামনে খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

স্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে স্টেশনের মধ্যে।

বিস্মিত হল হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি? 'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কি বিপদ! চিড়িয়াখানা না কি? ভেড়া ডাকছে! আরে, দিনে শেয়াল ডাকে! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল স্টেশনের দিকে। ও হরি! ও অন্ধ ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা তখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে! ও বাবা! শুধু গলাই মিঠে নয়, ছোকরা রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

"চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি বলিহারি—চোখে যে আর সইতে নারি
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে
হাতের ঘুরিফিরিতে।"

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে! ছোকরা উপু হয়ে বসে ডুবকি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে,—দন্তর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলির দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের কেশ-প্রসাধনরতা কালো মেয়েটির রচনারত হাত দুখানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুমভাঙা বড় বড় চোখ দুটিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ী ঝিটা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম করে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"রিনিঠিনি রিনিঠিনি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি—
আমার প্রাণের ব্যায়লা
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে।"

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোড়াটার দোলার মাত্রাও দ্রুততর হচ্ছে। উল্টে পড়ে না যায়! ও-পাশের বেঞ্চের উপর সদ্য ঘুমভাঙা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, মুচকি হেসে বললে, মরণ!

ছোকরার মাতন লেগেছে—

"হায় হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি—
জেবন সফল করিতে।
হায় হায়—থাকত না খেদ মরিতে।"

তেহাই দিয়ে সে গান শেষ করলে।

শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত অন্ধ দন্তরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা জ্বলন্ত বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে, নে, খা।

বিড়ি?

হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে, কে সিগারেট খাচ্ছে? একটা দ্যান না কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল, বেটা আমার বালকদাসী। "আমার নাম বালকদাসী, ভালমন্দ খেতে ভালবাসি!" সিগারেট খাবে! একটা সিগারেটের দাম কত জানিস?

আমার গানের বুঝি দাম নাই ?

নে, নে, খা। এই নে—এবার হারমোনিয়াম-বাজিয়ে একটা সিগারেট বার করে দিল তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে, পেনাম বাবুমশায়। ঘোড়া দিলেন, চাবুক ছান। দেশলাই জেলে ছান।

দেশলাই জেলে দিলে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছানি-পড়া চোখে আলোকশিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে।

সিগারেট টানে প্রাণপণে, সে টানের শক্তি-প্রয়োগে ওর মাথা থরথর করে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছোড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আঃ!

সকলে হাসে তার ভঙ্গী দেখে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে বাবুটি বললে, তুই তো বেশ গান গাইতে পারিস রে! অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ভাল। বুঝলেন বাবুমশাই সবাই বলে ভাল। তা—একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললে, খুব ভাল করে গাইলে—মানে, পানমন সমপ্পন করে গাইলে মোহিত করে দিতে পারি বুঝলেন ?

এবার তরুণী ছুটি খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চমকে উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল মাটিতে। মাটির উপর আঙুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব করে সে সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে বললে, হাসছে ? কে ? কারা ? তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে, মলিন্দ!

মলিন্দ—ওই কুলিদের একজন। সে বললে, কি ?

শোন্, বলি। সিগারেটটা হাত দিয়ে ঠিক গোড়ার দিকে ধরে নিলে।

কি ?

সরে আয়, কানে কানে বলব।

কি ? বল ?

মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক, লয় ?

হ্যাঁ। বদ্দমানের।

হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

কি করে বুঝলি ? অবিশ্বাসের হাসি হাসলে মলিন্দ।

বুঝলাম গলার রজ্ থেকে।

কিন্তু ভদ্রলোক জানলি কি ক'রে ?—মলিন্দ প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ, চুড়ির শব্দেতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই ও দুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল। ছোটনোক হলে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাচের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, লয়?

হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে, তা, ঠাকরুনরা হাসছেন, আপনাদিগে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা, চপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়টি ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে, আমাদের বলছ?

হ্যাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই মুখ টিপে হেসে বললে, সে আমরা নই, অন্য লোকে।

অন্য লোকে?—অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে, উহুঁ।

উহুঁ কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশি হেসে বললে, শিঙেতে বাঁশি বাজে না ঠাকরুন, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

ও মা গো!—মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত করে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল—কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবার বললে, আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি?

রাগ?—অন্ধ হেসে বললে, ওরে বাপ রে, আপনকাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায়? তবে হাসলেন কেন, তাই শুধালাম, বলি—অন্যায় কিছু বললাম না কি?

হারামজাদা!—দোকানী বলে উঠল, ওরে শুয়ার, হাসছেন তোমার 'মোহিত' শুনে।

কেনে, মোহিত করে দিতে পারি না আমি?

খুব হয়েছে। থামো।

কেনে?

কাকে কি বলছিস জানিস?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

ওঁরা হলেন কলকাতার গাইয়ে—কলের গান শোন নাই হারামজাদা!.সেই গাইয়ে—বড় বড় বাইজী। বেটা পক্ষীরাজ ওঁদিকে মোহিত করে দেবেন!

অপরাধীর মত সে এবার বললে, তা হলে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে। হাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ করে গামছা কাঁধে ফেলে, সুটকেস খুলে সাবান বার করে নিয়ে বললে, কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উপরের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে, দেখ দেখ, হারামজাদার মুখ দেখ। এই হারামজাদা পক্ষে।

অন্ধের নাম 'পক্ষী'। পক্ষে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি হেসে বললে, ভারি সোন্দর বাস উঠছে সিংজী। পরান একেবারে মোহিত করে দিল।

সুন্দরী মেয়েটি বললে, তোমার সেই মোহিত-করা গান যদি গাও, তবে তোমাকে এই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পক্ষী বললে, দিয়ে যাবেন? গান গাইলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে পক্ষী বললে, আমার আস্পদ্ধা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে; গান কি আপনকাদের সামনে গাইতে পারি আমি?

কেন? তুমি তো খুব ভাল গান গাইতে পার। ভারি সুন্দর গলা তোমার!

ভাল লেগেছে আপনার?—পক্ষীর অভ্যস্ত হাসিতে মুখ ভরে গেল।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে, এস আমার সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পক্ষী বললে, একটা কথা বলব ঠাকরুন?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে, বল।

রাগ করবেন না তো? অপরাধ লেবেন আমার?

না না। বল।

পক্ষী কিন্তু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, নেতাই, মলিন্দ! চলে গেলি না কি? নেতাই?

কেনে, নেতাইকে কেনে ?—দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে দোকানী বললে, জল খাবে না সব ? বাড়ি যাবে না ?

হেসে পঙ্কী বললে, আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে !

হুঁ দিলাম। জল খাবি তো আয়, আমি যাচ্ছি বাড়ি।

উঁহু। ক্ষিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে চারিদিক ধুলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্টেশনে টিনের শেডে উত্তাপের প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি এক দৃষ্টিতে অন্ধ পঙ্কীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঙ্কী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বললে, কই, বললে না তো ?

কি বলবে বলছিলে ?

বলছিলাম। পঙ্কী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

বল।—বলে মেয়েটি প্রতীক্ষা করে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই সে অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পঙ্কী ঘাড় তোলে মধ্যে মধ্যে, আবার ঘাড় নামায় এই অবসরের মধ্যে। হঠাৎ এবার সে বলে ফেললে, বলছিলাম কি—

ঠিক এই সময়েই মাথার উপরে টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল, কি রে বাবা ?

উ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঙ্কী বললে, রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

তাই না কি ? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে !

হ্যাঁ। এ এখন সেই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন, এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়। কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হল তার। সত্যিই কাক বসেছে ! সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল পঙ্কীর কাছে। পঙ্কী চঞ্চল হয়ে উঠল ! কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে, বলছিলাম কি আজ্ঞে—

মেয়েটি দুটি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঙ্ক্ষী বললে, বলব মশায় নির্ভয়ে ?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঙ্ক্ষীর নিষ্পলক চোখের সামনে থেকে! বললে, বল। বার বারই তো বলতে বলছি।

আপুনি একটি গান যদি গাইতেন? কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে, নিঃশব্দ হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে!—গান শুনবে ?

মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব করে পঙ্ক্ষী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ করে বললে, আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন। গানই বা শুনব কি ক'রে? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে তার দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে, সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালবাসি আমি।

কি মনে হল মেয়েটির—করুণা হয়তো, হয়তো বা খেয়াল—বললে, আচ্ছা। বলেই আবার চিন্তিত মুখে বললে, হারমোনিয়মটা যে দেখি অনেক জিনিসে চাপা পড়েছে।

হারমনি ?

হঁ্যা।

হারমনি থাক। আপনি এমনি গান! আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে গান, ভারি ভাল লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভাল লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে—

"কালা, তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের 'পরে, কভু নদী পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া-আঁখি।"

পঙ্ক্ষীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে, কেমন? ভাল লাগল ?

আজ্ঞে।—চকিত হয়ে উঠল পঙ্ক্ষী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

ভাল লাগল ?

পঙ্ক্ষী বললে, জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুন।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

হাসছেন ? তা একটু চুপ করে থেকে পঙ্ক্ষী বললে, তা, এমন গান জেবনে কোথ শুনতাম বলেন ? পঙ্ক্ষী কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনায় ছিল, তার স্পর্শে মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ করে গেল। কোন কথাও খুঁজে পেলে না !

পঙ্ক্ষী বললে, একটি পেনাম করব আপনাকে ?

প্রণাম ? কেন ?

ভারি সাধ হচ্ছে।

লোভ হল মেয়েটির। মুগ্ধ দৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন—অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম ? মনে পডল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশি বলে মনে হয় তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাড়িয়ে রইল।

পঙ্ক্ষী হাত বুলালে তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দুখানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভাল লাগল।

মেয়েটির পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্ক্ষীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার কে কে আছে বাড়িতে ? মা—মা আছে ? বাপ আছে ? শুনছ ? ওঠ। ওঠ। অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ !

আরে, এই বেটা ! এই ! ও হচ্ছে কি ? এই !—হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ধমক দিলে পঙ্ক্ষীকে।

কালো মেয়েটি বললে, মরণ !

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে, ওঠ। ওঠ।

এবার পঙ্ক্ষী উঠল ! তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এক সঙ্গে হেসে উঠল। চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে—গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে, মুখটা মোছ! গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে

লাল রঙ?

হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

আলতা?

হ্যাঁ, ঠোঁটে মুখে গালে নাকে। মুছে ফেল।

থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে, নে নে, ওর সঙ্গে আর ন্যাকামি করতে হবে না! ওদিকে দেখে এলাম ইঞ্জিনে জল ভর্তি হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরে।

কত দূর?

পক্ষী উঠে দাঁড়াল!—এই কাছে আজ্ঞে, কাছেই। চলেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি আসুন।

তুমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানাদের পথঘাট মুখস্ত। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না।—

কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে, নিশ্চিন্দি চান করবি, ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পক্ষী। মধ্যে মধ্যে পা ঝুলিয়ে অনুভব করে নেয়। স্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলার ছায়ায় এসে বসে বলে, এই বটতলা এসেছে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হতেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের মত জল।

মেয়েটি বললে, তোমার নাম কি?

আমার নাম? আমার নাম 'পক্কে'। 'পক্ষী' আর কি।

পক্ষী?

আজ্ঞে হ্যাঁ! ছেলেবেলায় পাখির মতন চিঁ-চিঁ করে চেঁচাতাম কি না; কানা বলে মা হেনস্তা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

মা বাবা আছে তোমার!

হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ি মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভাল। বাবার নাম এখানে—। হঠাৎ কথার ছেদ ফেলে দেয় নিজেই, উপরের দিকে মুখ তুলে বলে, হ—হ। মরালের বড় ঝাঁকটা এসেছে লাগছে।

একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক—মেটে রঙের বুনো হাঁস সত্যিই মাথার উপর পাক

দিচ্ছিল, তাদের পাখায় ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পঙ্ক্ষী বললে—তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করলে সে, বাবার নাম এখানে সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম—

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পঙ্ক্ষী। ভাল মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজন অনুভব করে নি কোন দিন।

পঙ্ক্ষী বলছিল। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্ক্ষী বললে, আমার দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা, এই আপনার মতন বয়েস তার।

আমার মত ?—ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে, আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি ?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্ক্ষী বললে, তা, আপুনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশি নন। একটু চুপ করে থেকে বললে, গলার রজ্‌ শুনে বুঝতে পারি কিনা খানিক-আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশির মত। খাদ মেশে নাই! তা ছাড়া—

পঙ্ক্ষী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পালটে বললে, এখান থেকে বাড়ি আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা, দিদি বললে, পকে, তুই তো গান গাইতে পারিস, তা ভাল বাজারে জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন হাত ধরে এখানে রেখে গেল। সেই অবধি—। নিঃশব্দে হেসে সে চুপ করে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আপনকার গানের ওইটুকুন ভারি সোন্দর! সেই কি—কালা তোমার যখন বাজে বাঁশি। বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে—

ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা-ঘষা হয় না, আমার কেশ-বাধা হয় না,
আরও হয় না কত কি!

মেয়েটি সাবান মাখছিল, বিস্ময়ে তার হাত থেমে গেল। অবিকল সুরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঙ্খী।

আঃ, নাইতে আর লাগে কতক্ষণ? ওদিকে যে ট্রেনের সময় হয়ে এল। —হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ট্রেন চলে গেল। খেমটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের চা শরবত জলখাবার বিক্রি শেষ করে ডাকলে, পঙ্খে! পঙ্খে!

পঙ্খের সাড়া পাওয়া গেল না। গেল কোথায়?

দোকানী ওকে সত্যই ভালবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালবাসে! যেদিন পঙ্খীর কোথাও অন্ন না জোটে, সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। দুটোর ট্রেন গেলেই দোকানী একবার পঙ্খীর খোঁজ করে। পঙ্খীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামেব মধ্যে গোবিন্দ-বাড়িতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য কিংবা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলায় পঞ্চপবে বলি হয়—পঙ্খে হিসেব রাখে কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, করে অষ্টমী, কবে সংক্রান্তি, সেদিন সে চণ্ডীতলায় যাবেই। নিশ্চয় দু জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিল! দুটোর ট্রেনের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেন।

চারটের ট্রেন এল, গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঙ্খে এখনও ফিরল না কেন? সে গেল কোথায়? খেমটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি?

সত্যই তাই। পঙ্খী চুপিচুপি ট্রেনে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়ে ছিল। জংশন স্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ-লাইনে গার্ড ড্রাইভার পঙ্খীকে চেনে। তারা বললে, তুই এখানে?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে, হঁ্যা। এখানেই এলাম। বলি, একবার ঘুরে ফিরে আসি। একটু চুপ করে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বললে, নতুন জায়গা, দেখতে শুনতে তো সাধ হয়!

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে, বেশ, দেখা তো হল, এইবার চল্।

ফিরে যেতে কিন্তু পঙ্খীর কেমন লজ্জা হল। সে বললে, না। থাকব এইখানে দুদিন দশদিন।

থাকবি ?

হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার।

উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পক্ষীর একটা কথা মনে হল।—গার্ডবাবু! গার্ডবাবু! গার্ডবাবুকে সে বলতে চাইছিল, এখানকার স্টেশন-মাস্টার জমাদার স্টলওয়ালা—এদের কাছে তার জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন স্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পক্ষী চলতে আরম্ভ করলে। ঠিক এসে উঠল স্টলের সামনে।

কি ভাজছেন গো দোকানী মশায় ? সিঙ্গারা কচুরি।

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে, সরে বস।

সরেই একটু বসল পক্ষী। তারপর সে তার ডুবকিতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে, ও কালা—

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হল না। নিজেকে নিজেই চিনিয়ে নিলে পক্ষী। দোকানী, স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, স্টেশন, জমির উপর পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ। জংসনের সারি-সারি রেল লাইন প্রায় অনায়াসেই পার হয়ে যায় সে। প্রথম এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করে, কে বটেন গো ? লাইনে গাড়ি রয়েছে না কি ?

লোক না থাকলে কান পেতে শোনে, ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না। তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ করে বুঝে নেই—চলন্ত ট্রেনের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। পক্ষী বলে, ভয় লাগলে শিরদাঁড়া যেমন শিরশির করে, তেমনই শিরশিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হলে লাইন ছেড়ে ওভারব্রিজের দিকে যায়—এক পাশের রেলিং ধরে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকির সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি স্থদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা করে কিনেছে। হাঁড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশি।

মধ্যে মধ্যে স্টেশন-ঘরের দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায়, একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাস্টারবাবুরা বসে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে, মাস্টারবাবু!

কি রে ব্যাটা ? এসেছ তো !

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা কি বলছ ?

আজ্ঞে !—মাথা চুলকায় পঙ্ক্ষী।

কি জিজ্ঞাস্য ? বর্ধমান কত দূর ? কত ভাড়া ?

আজ্ঞে না বলছিলাম, বলি— হাসির ভঙ্গীতে দস্তুর পঙ্ক্ষী আরও দন্ত বিস্তার করে বাবুদের কাছে থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে। পায় সে উৎসাহ বাক্য।

কি বলছিলে ? বর্ধমান শহরটা কেমন ? কত বড় ?

হ্যাঁ—আরও একটু বেশি দন্তবিস্তার করে সবিনয়ে।

বর্ধমান যাবি ? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়িতে ?

পঙ্ক্ষী চুপ করে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ি-ঘোড়া লোকজন গলি-ঘুঁজি—প্রকাণ্ড বড় শহর, তার মধ্যে কোথায়—

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ করে ওঠে। ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন ঠিন, বাবরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঙ্ক্ষী উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোস্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ করে কাঁপে। পঙ্ক্ষী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোস্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে, টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক-টকা টরে। তারপরে বলে, হ্যালো ! হ্যালো ! ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন ? আমি পঙ্ক্ষী। গান গাইছি আমি। 'ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি !

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঙ্ক্ষী জংশনেই রয়েছে। টাকা-পয়সা কিছু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ওই তার সব। কিন্তু পঙ্ক্ষী তার উপার্জন ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকিটা রাখে জেনানা ওয়েটিংরুম—কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর-কুঠরির মত ঘরটার এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ-লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিংরুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

বর্ধমানের বাত্তিকটা কমে গিয়েছে। 'কালা তোর তরে' গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে। পঙ্ক্ষী সবিনয়ে হাসে কিন্তু আর সেই চৈত্র-তুপুরে গেঁয়ো স্টেশন-প্লাটফর্মে নরম তুখানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণ-মাতানো গন্ধের কথাও মনে পড়ে না;—মনে পড়ে না ঠিক নয়, পড়ে, কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন। হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শিরশির করে কি বয়ে গেল। লাইনের উপর ট্রেন গেলে যেমন শব্দে স্পর্শে শিহরণ জাগে।

সেই গান। সেই গলা। আজ আর গান শুধু নয়, গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। স্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুন গান করছে, "কালা তোর তরে—"

পঙ্ক্ষী ছুটে এসে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুনের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় করে বললে, ঠাকরুন!

কে রে তুই?

আজ্ঞে, যে ঠাকরুন গান গাইলেন তাঁকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। একজন বললে, মরণ।

আবার গান আরম্ভ হল। "চোখে ছুটা লাগিল—!" পঙ্ক্ষীর বুক একেবারে তুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল। ঠাকরুন শিখেছিল তার কাছে। গান শেষ হল।

আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুন। আমি পঙ্ক্ষী।

এই ব্যাটা, এই! ভাগ।

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটি আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে, গ্রামোফোনটা ভাল করে বন্ধ করিস। রেকর্ডগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নে।

গাড়ি এল, চলে গেল। স্টেশন-স্টাফ স্টলওয়ালা বিস্মিত হল। পঙ্ক্ষী নাই।

আরও অনেক কাল পর। অনেক বৎসর চলে গিয়েছে। পঙ্ক্ষীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখে দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে এসেছে। লাইনে পা দিয়ে দূরে ট্রেন আসছে কি না আর ধরতে পারে না।

পঙ্কী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষে করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে, অন্ধজনে দয়া কর বাবা। অন্ধকে পয়সা দাও মা। মা লক্ষ্মী—জননী!

মা-জননীরা যখন যায়, তখন পঙ্কী বেশি আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খসখস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজার ফুলের গন্ধ ওঠে, পঙ্কী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয়, সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। "চোখে ছটা লাগিল" গাইতে আজকাল ভাল লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশি গায়। "কালা তোর তরে—" গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে, খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারীকণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঙ্কী। মেয়েটি বললে, গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?

ওই তোমার এক ঢঙ! আর তীর্থে কাজ নেই। চল, ফিরে চল।

নাঃ। বয়স অনেক হল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া আর—

অসহিষ্ণু পঙ্কী বলে উঠল, কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে, আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।

আধুলি?

হ্যাঁ।

আধুলি? মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে, মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে নিলে পঙ্কী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বাড়িয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখিরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হল। পঙ্কীও উঠল।

রূপ স্বতন্ত্র বস্তু—রূপ তাহার কোন কালে ছিল না; তবে অন্ন-বস্ত্রে দেয় যে শ্রী—সে শ্রী তাহার ছিল। কিন্তু সেটুকুও তাহার থাকিল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে নয়, কয় মাসের কারাক্লেশ জলৌকার মত শ্রীটুকু যেন শোষণ করিয়া লইল। জেলে ক্লেশ কিছু সে পায় নাই, কিন্তু তবুও চারমাসের মধ্যেই আমাশয় ও চোখের অসুখে কুব্জ, শ্রীহীন হইয়া ফিরিল। স্থূলতা বর্জিত শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; খদ্দরের পোষাকও ভারী বোধ হইতেছিল। অবয়বের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে—দেহের শ্যামবর্ণ প্রায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে লাবণ্য আর ফিরিল না। শ্রী না ফিরুক দেহ সুস্থ হইল।

জেল হইতে ফিরিয়া তাহার নেশা পড়িল লেখায় এবং গাছ পোঁতায়। নিজেই মাটি কোপাইয়া ফুলের বাগান করে, গ্রামের প্রান্তের প্রকাণ্ড বড় বাগানটায় বট অশ্বত্থের ডাল ও চারা পোতে, ফুলের গাছও পোতে—কিন্তু সংখ্যায় কম। রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার শ্রীহীনতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আন্দোলনের পূর্ব হইতেই জামা জুতা সে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পরণে থাকে মোটা কাপড় আর কাঁধে চাদর। চাদর আবার সব সময়ে নয়, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চাদরটা কাঁধে চাপে। অন্য সময়ে খালি গা, খালি পায়ে সে মূর্তিমান শ্রীহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জেলে থাকিবার সময় ছোট ভাই সংসার ঘাড়ে লইয়াছিল—সে সংসার তাহার স্কন্ধে দৈত্যের স্কন্ধের আকাশের মতই চাপিয়া রহিল। শিবনাথ সে আর ঘাড়ে করিল না। তবে উপদেশ দেয়—সময়ে সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া সংসার রথখানিকে অপেক্ষাকৃত সবল ও দ্রুত গতিশীল করিয়া দেয়।

দ্বিপ্রহরে এক গা ঘামিয়া সেদিন শিবনাথ বাড়ি ফিরিল। খালি গা, খালি পা—কোমরে গুঁজিয়া কাপড়খানা পর্যন্ত হাঁটুর উপর টানিয়া তোলা, সাড়া না দিয়াই বাড়ি ঢুকিল।

শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও ছোট বৌ অমলা বারান্দায় থামের আড়ালে বসিয়া পান সাজিতেছিল, গৌরী বলিল, শম্ভু এদিকে শোন দেখি!

শম্ভু শিবনাথের বাড়ির মাহিন্দার।

শিবনাথ সটান খিড়কীর বাগানের দিকে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—শম্ভু কোথায় গেল মন্নুর মা?

রন্ধনশালে ব্যস্ত পাচিকা মন্নুর মা বলিল—কে জানে বৌদিদি, দেখি নাই ত। কেউ আসে নাই ত'!

ছোট বৌ অমলা মিহিভাবে বলিল, আসবে না কেন—খিড়কী দিয়ে গেল চোখের সামনে।

গৌরী রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—চাকর-বাকর অবাধ্য হয়েছে দেখেছ! ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। তা বলব কাকে বল? বড়বাবুই চাকর বাকরের মাথা খেলে। এখুনি শম্ভু খিড়কী দিয়ে গেল।

খিড়কীর রাস্তাঘরে পদশব্দ উঠিল। মন্নুর মা বলিল—ওই যে, ওই যে বাবু আসচেন।

গৌরী বলিল—এই শম্ভু, বেয়াদপ চাকর কোথাকার—

প্রথমটা না লক্ষ্য করিলেও শিবনাথ খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিয়া সব বুঝিয়াছিল। সে হাসিমুখেই জোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—অধম কে একান্তই শম্ভু পদবাচ্য হ'ল হুজুরাইন?

মন্নুর মা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ছোট বৌ-এর চাপা হাসির খুক্ খুক্ শব্দ বেশ শোনা যাইতেছিল। গৌরী নিজেও না হাসিয়া পারিল না—বলিল, মা গো মা, কি অপ্রস্তুত করতে পার তুমি মানুষকে—না বাপু, ছি, ও কি?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল—আমার কথাটার উত্তর দাও, আমি কি শম্ভুর কেলাসে পড়লাম তা হ'লে?

গৌরী স্বামীকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল—কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে বল দেখি? সর্বাঙ্গে ধুলো, শরীরের এই অবস্থা—ছি ছি ছি। বস দেখি, একটু বাতাস করি। ভোলাদাসী, জল দে ত এক বালতী! ছোট বৌ আমার সাবান আর তোমার ভাসুরের গামছা দেখে দাও ত।

ভোলাদাসী বাড়ির ঝি।

খেয়ালের সুর চাপা পড়িয়া ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ হয় দেখিয়া শিবনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল—ধীরে মহাশয়া ধীরে, ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ করতে হয় ধীরভাবে সুস্থচিত্তে। একটু অপেক্ষা কর, এই গাছ কটা পুঁতে আসি!

গৌরী বলিল—হাত মুখ ধোও, জল খাও, তারপর। সে স্বামীর হাত হইতে গাছের চারা কয়টা টানিয়া লইল। আর উপায় ছিল না—শিবনাথকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর কিন্তু শিবনাথের মন্দ লাগিল না—তপ্তদেহে শীতল বারি সিঞ্চন, তাহার সঙ্গে পাখার মৃদু বাতাস, সকলের উপর মিছরীর সরবৎ—মন্দ কেন, খুব ভালই লাগিল। সে চোখ মুদিয়া পরম আরামে বলিল—আঃ!

গৌরী বলিল—দেখ, কিছুদিন কোথাও গিয়ে শরীর সেরে এস তুমি! আর জামা জুতো পর—ও ছেড়ে আর—

মধ্যপথেই শিবনাথ বলিল—কেন, অম্‌নি আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে!

গৌরী বলিল—আমার কথাই তোমার পছন্দ হয় না। কিন্তু মা থাকলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলতেন।

শিবনাথ বলিল—তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন। কিন্তু, কন্যা কাময়তে রূপ,—সখি, আশঙ্কা আমার তোমার সম্বন্ধে।

গৌরী এবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমাকে যেতে হবেই। আর জামা জুতো তোমাকে পরতেই হবে।

শিবনাথ উত্তর দিল—শরীর ত আমার অসুস্থ নয় গৌরী। আর বেশভূষা জীবনের পক্ষে বাহুল্য বলেই আমি মনে করি।

গৌরী বলিল—ও শরীর তোমার ভাঙতে কতক্ষণ? তা ছাড়া শ্রী বলে জিনিষটাও ত' দরকার। আমি টাকা দিচ্ছি।

শিবনাথ মুদিত চোখেই উত্তর দিল—কি হ'বে রূপ, কি হবে বেশভূষা, মহাকালের দরবারে—

গৌরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

শিবনাথ তবুও একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—রূপ দেখে যদি ভালবাস সখি—।

কিন্তু রসিকতা জমিল না, গৌরীর মুখ দেখিয়া গানের কলিটা সে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে পারিল না।

শিবনাথ স্ত্রীর অনুরোধ রাখিল না। তাহার সেই এক উত্তর—কি হবে? সে গ্রাম প্রান্তের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত ধারার চিন্তা করে, লেখে—মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইলে গাছ পোঁতে।

গৌরী অবশেষে দেবর দেবনাথকে দলে টানিয়া শিবনাথকে পরাজিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার ফল কিছু ফলিল, স্থির হইল, এখন কয়েক মাস আর এমন করিয়া শিবনাথের ঘুরিয়া বেড়ান হইবে না। বাড়িতে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম দেখিয়া দিতে হইবে। শিবনাথকে স্বীকার করিতে হইল। কর্তব্যে সে অবহেলা করে না।

গৌরী বলিল, তবু আমার কথাটা রাখলে না!

শিবনাথ বলিল—তোমার কথাই ত' রাখলাম।

—না, ভাই-এর কথা রাখলে। কেন—সে কথাও আমি জানি

—কেন শুনি ?

—বই ছাপাতে টাকা চেয়েছিলে তুমি, আমি দিইনি—তাই। আমার টাকায় শরীর সারতে পর্যন্ত যাবে না তুমি। আমার ব্রতের কাপড় জামা জুতো ছাতা—সে পর্যন্ত নিলে না তুমি।

শিবনাথ বলিল—পাগল তুমি! গৌরীর কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল—টাকা দেবার আমি কে ? টাকার মালিক ছেলেরা। তারাই মায়ের দৌহিত্র। একথাটা তুমি বুঝলে না, আমার উপর রাগ করলে।

শিবনাথ বলিল—ও তোমার ভুল ধারণা গৌরী। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু কথাটা সে চিন্তা না করিয়া পারিল না। বৈঠকখানাটা জনশূন্য—চাকরটা বাজারে গিয়াছে, চাপরাশীটা এই মাত্র গেল দেবনাথের সঙ্গে মাঠে, নায়েব স্থানীয় ব্যক্তি, কি কারণে সে আজ আসিতে পারে নাই। শিবনাথ একা বসিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল।

গৌরী কিছু মাতৃধন পাইয়াছে—হাজার নয় টাকা। টাকাটা কতক ক্যাস সার্টিফিকেটে আবদ্ধ আছে, কতক গৌরীর পিতৃকুলের এক ব্যবসায়ে ধার দেওয়া আছে—সুদটা তাহার মাসে মাসে পাওয়া যায়। কিছু টাকা শিবনাথ একবার চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরী দেয় নাই। শিবনাথ ভাবিতেছিল, গৌরীর কথাটা কি সত্য ?

চিন্তাটা সুখপ্রদ মনে হইতেছিল না, মনে মনে যেন অপরাধ আংশিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইতেছিল। শিবনাথ উঠিয়া সেরেস্তার খাতাপত্রগুলা লইয়া বসিল।

কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া শিবনাথ দেখিল এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার।

শিবনাথও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—বসুন। বসিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—নতুন বহাল হয়েছেন বুঝি আপনি?

নগ্নগাত্র শিবনাথ বুঝিল ভদ্রলোকের ভুল হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ভদ্রলোক তাহার হাতদুটি জোড় করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—পাঁচটা টাকা আপনাকে পান খেতে দোব নায়েববাবু। আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িয়া গেল। দুই কুল বজায়ের উপায় না পাইয়া সে নায়েব সাজিয়াই বসিল।

বলিল—কি কাজ বলুন।

ভদ্রলোক বলিল—বাবুদের দরবার থেকে পাঁচ টাকা করে বার্ষিক বৃত্তি ছিল আমাদের। গত বছর থেকে সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন বড়বাবু। তা সেইটি আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—বৃত্তি বন্ধ হ'ল কেন? বড়বাবু ত—

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিয়া বসিল—আর মশায়, নতুন লোক আপনি—ক্রমে বুঝতে পারবেন। সে এক আচ্ছা লোক। এখন ব্যাপারটা শুনুন। বাবুদের মহাল ২১৯ নং তৌজি পাবনায় আমার শ্বশুরবাড়ি—বৃত্তি আমার শ্বশুরদের পৈত্রিক। আমিই সব সম্পত্তি পেয়েছি—শ্বশুরের ছেলেপিলে নাই। শ্বশুরের পৈত্রিক দুর্গাপূজা ছিল; বিজয়ার পর যাত্রার দিন আমার শ্বশুর প্রতিমার গলার পৈতে নিয়ে আসতেন—বাবুরা পাঁচটি টাকা দিতেন। এখন এবার আসতেই ছোটবাবু বললেন—বৃত্তি আপনি পাবেন না; কেন মশায়, জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম শ্বশুরের দুর্গাপূজো ত আমি আর করি না। সেই জন্যে বড়বাবুর হুকুম।

শিবনাথের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল—পূজোটা বন্ধ না করলেই হত!

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বেশ মশাই আপনি। খরচ কত! তা ছাড়া ইস্কুল মাস্টারী করি, ছুটি হয় সেই পঞ্চমীর দিন। কখনই বা কি করি!

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—তা আমি বলব বাবুকে।

ভদ্রলোক বলিল—হ্যাঁ, ছোটবাবুকে নয়, বড়বাবুকে বলবেন। আচ্ছা ঘড়েল লোক মশাই ছোটভাইকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আড়াল থেকে

হুঁঃ—বেশ! আরে মশাই পাঁচ দিন এসে দেখাই পেলাম না। কোথা? না, বাড়ি নাই—মাঠে নয়, বাগানে।

তারপর সহসা মুখটা খুব কাছে আনিয়া বলিল—এত বাগানে কেন মশাই, বলি মালটাল—এ্যাঁ? এদিকে ত স্বদেশীতে জেল টেল খেটে এলেন।

শিবনাথের এর পর হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে কোনরূপে বলিল—কই, সে রকম ত শুনি টুনি নাই।

চোখের ইসারা করিয়া ভদ্রলোক বলিল—আরে মশাই, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না।

শিবনাথ ভদ্রলোককে বিদায় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এখনি কে হয়ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সে বলিল—আমি বলব। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক আবার তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে বলব বললে হবে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উদ্ধার করে দিতেই হবে। আমি বরং আরও কিছু—

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—আমাকে কিছু লাগবে না। তবে বড়বাবু যে ধারার মানুষ—

ভদ্রলোক বলিল—আরে, দেখা পেলে দেখি কি ধারার মানুষ। বুড়ো-ছেলে শাসন করার অভ্যেসও আমার আছে। এই দেখুন, আপনাকে দশ টাকা দোব আমি। আচ্ছা চললাম আজ—নমস্কার।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেই শিবনাথ তক্তাপোষের উপর গড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। একা একা এতটা কৌতুক ভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল। শিবনাথের বাড়ি ও বৈঠকখানার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে—একটা রাস্তা পার হইয়া সামান্য একটু যাইতে হয়। বৈঠকখানা হইতে রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই ভদ্রলোক তাহারই এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্ধুটি বলিয়া উঠিল—এই যে শিবনাথ! এই ভদ্রলোক—ও মশায়, ও সীতারামবাবু—চলে যাচ্ছেন কেন, এই যে শিবনাথ।

সীতারামবাবু ততক্ষণে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে অনেকটা চলিয়া গিয়াছেন।

শিবনাথের হাসিতে নূতন জোয়ার ধরিয়া গেল। তবুও সে ডাকিল—শুনুন, শুনুন সীতারামবাবু।

অল্প দূরেই পথটা একটা মোড় ফিরিয়াছে। সীতারামবাবু সেই মোড়ের মধ্যে তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুটি হতবাক হইয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—কি ব্যাপার বল ত শিবনাথ? ভদ্রলোক আমার জানা লোক, তাই দেখা হতেই বল্লেন শিবনাথবাবুকে ধরে একটি কাজ করে দিতে হবে আমার। তাই সঙ্গে আসছিলেনও আমার, কিন্তু তোমাকে দেখেই—কি ব্যাপার বল ত?

শিবনাথ তখনও প্রচুর হাসিতেছিল—সে হাসির মধ্যেই কোনরূপে বলিল—পরে বলব দাদা, এখন হাসতে দাও!

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতেই বাড়ি চলিয়া গেল। বাড়ির সকলেও হাসিয়া আকুল হইল। গৌরী, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন পরিষ্কার করিতেছিল। সে গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ির পুরাতন ঝি সতীশের মা বলিতেছিল—তা বাপু লোকের দোষ কি! বাবুলোকের চেহারা হবে এ্যাই থল্‌থলে—এই ভুঁড়ি! এ্যাতখানি জায়গা জুড়ে বসে থাকবে পাহাড়-পর্বতের মতন! এই জামা, চক্‌চকে জুতো, মস্‌ মস্‌ করে যাবে! তা-না এই এক ঢং বাপু তোমার।

শিবনাথ গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল—শুনলে হাসির কথা!

কাজের অজুহাতে ওঘরে যাইতে যাইতেই গৌরী উত্তর দিল—কালা ত নই, শুনলাম বৈকি! কিন্তু হাসির ত এতে কিছু নাই।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—কি রকম?

—তা বৈ কি। আড়ি পেতে শোন যদি তবে নিরেনব্বই জনকে অমনি ধারার কথা বলতে শুনবে। নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের সম্বন্ধে কথা শোনাও আড়িপাতারই সামিল। ও অতি ছোট কাজ।

গৌরীর কথার স্বরে ও অর্থে বাড়ির হাস্যচটুল বায়ুস্তর যেন দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শিবনাথও মনে যেন একটু আঘাত পাইয়াছিল, তবুও সে রহস্য করিবার চেষ্টা করিল—হতভাগ্য শিবের কপালে পতিনিন্দা শুনে গৌরীও শেষে সতীর মত দেহত্যাগ না করেন—আমি তাই ভাবছি।

গৌরী শান্তস্বরে উত্তর দিল—দেহত্যাগ করে আর লাভ কি বল? গৌরী

দেহত্যাগ করলে মহাদেব আবার বিবাহ করবেন, মাঝখান থেকে গৌরীর কার্তিক-গণেশই ভেসে যাবে।

কথাগুলির গঠনের ভঙ্গীতে রহস্য বলিয়াও ধরা যায়—কিন্তু অতি কুৎসিত ব্যক্তির রোদন-বিকৃত মুখ দেখিয়া যেমন হাসা যায় না—তেমনি এ কথাগুলি শুনিয়াও কেহ হাসিতে পারিল না। শিবনাথও নীরব হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিল—এত রূপের আকাঙ্ক্ষা কেন বল ত তোমার?

অতি রুষ্ট কণ্ঠস্বরে গৌরী উত্তর দিল—এত বড় জঘন্য কথাটা তুমি বললে আমাকে! অতি ইতর তুমি!

শিবনাথের কর্কশ কৃষ্ণমুর্তি ক্রোধে কুৎসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—যা সত্য তাই বলেছি! সত্য কথা ইতরে বলে না– ইতরেই সত্যকথা সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে না।

পাচিকা মন্থর মা বলিল—তা বাবু একবার ঘুরেই আসুন না। বৌদিদি ত ভাল কথাই বলছেন!

শিবনাথ উত্তর দিল—সে খরচ করবার মত অবস্থা আমার নয়। তার চেয়ে স্নো-পাউডার মেখে রূপ বাড়ান কম খরচে হয়। বলিতে বলিতেই সে উঠিয়া বৈঠকখানায় দিকে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গেছে। শিবনাথ তখন খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। দুই চারিখানা কাগজের লেখার তাগিদ, পত্রের জবাব তাহাকে নিত্য দিতে হয়। পরিশ্রমও সে করে অগাধ। কিন্তু গাছের নেশা—উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে মাঠে ঘোরার নেশা, বেশভূষায় উদাসীনতা এখনও তাহার তেমনি আছে।

সেবার বর্ষার সময় খেয়াল হইল ঘর মেরামতের। রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া নয়—রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া সে নিজেই কাজ আরম্ভ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশের পথ ছিল না—সেখানে সে পাঁচিল ভাঙ্গিয়া এক নূতন ফটক ও একপ্রস্ত সিঁড়ির প্রয়োজন অনুভব করিল। আর তৈয়ারী করিতে হইবে বাগানের মধ্যে একটা পাকা বেদী।

ছোট ভাই বলিল—তোমার অদ্ভুত খেয়াল দাদা। বেশ ত, রাজমিস্ত্রী লাগান হোক।

শিবনাথ নিজের হাতেই বনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। সে বলিল—উঁ-হু। দেবনাথ জানে এ লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সে দাদাকে কিছু না

বলিয়া বাড়িতে গিয়া গৌরীকে ধরিল—পার ত তুমি পারবে বৌদি—তুমি বল।

গৌরী বলিল—পাগল তুমি দেবু! মহাপুরুষ যারা হয় তাদের ঐ ধারা! কারও কথা তাদের রাখতে নাই। আমি পারব না ভাই, আমাকে বলো না।

দেবু বলিল—প্রজা সজ্জন আসে যায়, তারা দেখলে কি বলে বল ত? মাথার ওপরে এই কড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি!

গৌরী বলিল—তারা হীন ব্যক্তি, তাদের বলা কওয়ায় কি আসে যায়! আর রোদ বৃষ্টি প্রকৃতির দান—ওতে কি শরীরের অনিষ্ট হয়? তা ছাড়া খালি গায়ে, খালি মাথায়, রোদ বৃষ্টিতে মহাপুরুষদের কষ্টও হয় না।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। গৌরী জলখাবার সাজাইয়া একখানা রেকাবী দেবুর হাতে দিয়া বলিল—খাইয়ে এস দেখি। চাকর-বাকরের হাতে দেওয়া ত মিথ্যে—পড়েই থাকবে।

পনর দিনেও সিঁড়িটা শেষ হইল না। সেদিন সকালে শিবনাথ মাথায় এক মাথালী দিয়া সিঁড়ির উপর সিমেণ্ট চালাইতেছিল। পনর দিনেই রৌদ্রে তাম্রাভ রংএ তাহার কাল ছোপ ধরিয়াছে—পিঠখানার রং গাঢ় কাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিওন আসিয়া প্রশ্ন করিল—এই, বাবু আছেন রে?

শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে, চিনতে পারি নাই আপনাকে। একটা রেজেষ্ট্রী আছে, খারিজ ফিজের নোটিশ।

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া সে হাসিয়া বলিল—রেজেষ্ট্রী ছোটবাবুকে দাও গে যাও।

চিঠিগুলোর কয়খানা কাগজের পত্র, একখানা তাহার মামার, অপর খানা দিয়াছেন তাহার ভগ্নীপতি। ভাগ্নীর বিবাহ আগামী সপ্তাহে, তিনি তাহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। দিদিও পত্র দিয়াছেন—এবার দেবুকে পাঠাইলে চলিবে না। তাহাকেই আসিতে হইবে, অন্যথায় তিনিও কখনও আর শিবুর বাড়ি আসিবেন না।

শিবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। ভগ্নীপতির দেশ বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে—রেল স্টেশন হইতে মাইল পাঁচেক দূরে যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা বর্ষার জলে কাদায় অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। পৌঁছিবামাত্র ভগ্নীপতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন—এস এস ভাই, এস। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার শিবু? খালি পা—খালি গা—এ কি!

শিবু হাসিয়া বলিল—চাষার চেহারা আবার কবে সজ্জনের মত হয় জামাইবাবু! এই ত চাষীর পোষাক।

ভগ্নীপতি উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু ইনিই আপনাদের প্রিয় লেখক শিবনাথ—আমার তালব্য শয়ে আকার লয়ে আকার। কেমন হে? আর ইনি—

তৎপূর্বেই ডাক্তারবাবুটি আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার পরিচয়—এ ভিলেজ ডক্টর, সামান্য ব্যক্তি। ভারী সুখী হলাম! ভারী ভাল লাগে আপনার লেখা। আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে কিন্তু একদিন যেতে হবে আপনাকে।

ভগ্নীপতি বলিলেন—হবে ডাক্তার, হবে। এখন পনর দিন ছাড়ব মনে করছ? তবে চোয়াড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে কি করবে? চলহে, বাড়ির ভেতরে চল—দিদি তোমার দশবার খোঁজ করেছে এর মধ্যে—শিবু এল?

শিবু বলিল—যে রাস্তা আপনাদের!

বাড়ির মধ্যে দিদি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এ কি দশা হয়েছে তোর শিবু? এঁা, সেই শিবু তুই! বলে না দিলে ত তোকে আমি চিনতেই পারতাম না। বৌ লেখে, শরীর খারাপ হয়েছে তোর, কিন্তু এত খারাপ! সে রাক্ষসী সেবা যত্ন করে না নাকি? বস, বস, আমি বাতাস করি। আর এ কি পোষাক পরিচ্ছদের শ্রী-রে তোর?

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—এক কাপ চা দাও দেখি আগে।

দিদি ডাকিয়া বলিলেন—অ ভাই বিনী, চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত। আর ওরে নবীন—হাত মুখ ধোবার জল দে।

ওদিকের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখেই কতকগুলি ঝিউরী মেয়ে—তাদের পিছনে কতকগুলি বধূ। দিদি বলিলেন—মেয়েরা সব দেখতে এসেছে তোকে। আমাদের এখানে লাইব্রেরীতে তোর বই সব আছে কি না—আর সব কাগজই আসে ত।

শিবু হাসিয়া বলিল—তা ছাড়া তোমার মত সজীব বিজ্ঞাপন যখন রয়েছে, তখন এখানে শিবুর খ্যাতির অভাব কি?

দিদি বলিল—না রে না, আমি মিথ্যে বড়াই ক'রে বেড়াই না। কিন্তু ও চেহারায় তোকে দেখবে কি বল্ ত?

শিবু বলিল—ভয় কি দিদি? জামাইবাবুর অনূঢ়া ভগ্নী ত নাই যে এই চেহারায় বরমাল্য গলায় নিতে হবে—টোপর পরতে হবে!

শিবুর মাথায় এক চপেটাঘাত করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন—ওরে শালা, আমাকে পাল্টে শালা বলতে চাও তুমি!

দিদির ননদ বিনী বা বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এক কাপ চা হাতে দিয়া বলিল—দুধ বেশী হয়ে গেছে, গরমও নেই, শিগ্‌গির খেয়ে নিন।

দিদি বলিল—খাসনে শিবু খাসনে, মাড় মাড়—চা নয়।

তাহার পূর্বেই শিবু চুমুক দিয়াছিল—সেটুকু ফেলিয়া দিয়া শিবু বলিল, মাড় খুব পুষ্টিকর জিনিষ, সেণ্ট পারসেণ্ট ভিটামিন। আর আমার মত চাষার পক্ষে উপযুক্ত বস্তু।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

শিবনাথের উপর পড়িল বরযাত্রী সম্বর্দ্ধনার ভার।

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—দেখো ভাই, সহুরে জীব সব, তার ওপর আসছেন বরযাত্রী, বিজয়ী প্রুসিয়ান সৈন্যের মত বিক্রমে আসবেন। প্রথম মোহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

মাথায় এক তোয়ালে জড়াইয়া শিবু যাইবার জন্য সাজিল, বলিল—কোন চিন্তা নাই আপনার। খান দশেক গো-গাড়ী ও খান দুয়েক পাল্কী লইয়া শিবু স্টেশন হইতে বরযাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করিল। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু করিয়া কাদা জমিয়াছে। শিবু যখন স্টেশনে পৌছিল তখনও ট্রেণের বিলম্ব ছিল। একজন খাবারওয়ালাকে ধরিয়া সে চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

বরযাত্রীর দল স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাদা! এ কি দেশ বাবা! এ কথাতো ছিল না!

শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল, এই আমাদের দেশ। তবে কষ্ট বিশেষ করতে হবে না, যেটুকু কষ্ট ঐ দোকান পর্যন্ত। ওখানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠবেন, বাড়ির দোরে নামবেন।

একজন বলিল—বলিহারি ইয়ার! জুতোর কাদা ঘুচোবে কে?

বরকর্তা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, করবে কি আর, উপায় কি? এক কাজ কর, জুতো খুলে ফেল সব।

তরুণ দলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল—জুতো হাতে করে বরযাত্র যাওয়া, এ ত নতুন।

বরকর্তা বলিলেন—তোমরা জুতো হাতে করবে কেন, ঐ যে চাকর না সরকার ওকেই দাও সব। এই, জুতোগুলো সব নাও হে তুমি। একখানা বস্তা আন বরং।

শিবু অদূরবর্তী একজন গাড়োয়ানকে ডাকিল—ওরে—

একজন বরযাত্রী তাহার মাথায় সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ওকে বলা হল ত উনি আবার বলেন ওকে। নে বেটা, তুই নে না। তোকেই নিতে হবে।

ভাবী বৈবাহিক তখন ক্রুদ্ধ মার্জারের মত গোঁফ ফুলাইয়া বলিতেছেন—লোক নাই জন নাই, কি ব্যাপার সব? পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক means হাফ চাষা।

শিবু হাসিমুখেই বস্তা ঘাড়ে লইয়া জুতা সংগ্রহ করিতেছিল। সে বেয়াইকে বলিল, আপনার জুতো জোড়াটা?

দোকানে আসিয়া আর এক হাঙ্গামা, ভাঁড়ে চা কি ভদ্রলোকে খায়?

শিবু বলিল—আজ্ঞে কাপের চেয়ে ভাঁড় ভাল, কাপে কত জনে খায়!

একজন বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ইম্পার্টিনেণ্ট চাকর ত! দে ত বেটার কান মলে।

শিবুর সঙ্গে চাপরাশী ছিল জন কয়েক। তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইসারা করিয়া শিবনাথ তাহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ করিল। যাই হোক—নেশার বস্তু চা এবং সে চা যখন আর রাস্তার মধ্যে পাওয়া যাইবে না, তখন অগত্যা ভাঁড়েই খাইতে হইল। ভাঁড়ে চা বিস্বাদ লাগিল কি না সে প্রশ্ন করিতে শিবু সাহস করিল না। গাড়ীতে উঠিবার সময় জুতো চাই—শিবনাথ পূর্বেই জুতোগুলি জোড়া মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বরযাত্রীরা বলিল—পায়ে যে কাদা, জুতো পায়ে দিই কি করে?

শিবু গাড়োয়ানদের হুকুম করিল—জল এনে দে, বাবুরা পা ধোবেন।

একজন গাড়ীতে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এইখানে পা ধুয়ে দাও বাবা, কাদার ওপরে পা ধুয়ে লাভ কি?

সহযাত্রীরা তাহাকে তারিফ করিয়া উঠিল—দি আইডিয়া। ব্রেণ কি রে বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাড়ীতে চড়িয়া পা বাড়াইয়া বসিল। গাড়োয়ান পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে উদ্যত হইতেই বরযাত্রীরা বলিয়া উঠিল—থাক্ থাক্। শোন ত হে ইয়ার খানসামা, শোন ত।

শিবনাথ কাছে আসিতেই সে বলিল—খোল ত বাপধন মাথার তোয়ালে খানি, মোছ, পা মুছে দাও।

একে একে সকলের পা মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতেই সে গাড়ীর সঙ্গ ধরিল। গাড়ীতে স্থান তাহাকে কেহ দিল না; অগত্যা সে একজন গাড়োয়ানের স্থানে বসিয়া পাচন হাতে গরু ঠেঙাইতে বসিল—হেৎ-তা-তা বাপধন রে আমার!

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—ব্যাপার কি হে শিবু, চাপরাশীরা বল্লে আমায়, ওরা নাকি তোমার মাথায় চড় মেরেছে, জুতো বইয়েছে—

হাসিয়া বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—যেতে দিন না জামাইবাবু, ও সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে শুভকর্মে একটা ব্যাঘাত ঘটাবেন?

সজল চক্ষে গোপালবাবু শুধু বলিল—ভাই শিবু!

শিবনাথ তাড়া দিয়া বলিল—যান, কাজে যান। কোথায় কি হয়ে যাবে। শেষে আপনাকে হয়ত, কান নাক মলিয়ে ছাড়বে।

গোপালবাবুও এবার অল্প একটু হাসিয়া বলিল—তোমাকেই ডাকতে এসেছি, আলাপ করবেন বেয়াই মশায়। উনি আবার সাহিত্যরসিক লোক কিনা।

শিবু বলিল—না না, সে হয় না জামাইবাবু। ভারী অপ্রস্তুত হবেন ওরা। গোপালবাবু বলিল—তুমি না গেলে হয়ত ভাববে তুমি রাগ করেছ, কারণ, জানাতে ওরা পারবেই যে তুমিই স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে।

শিবুকে দেখা দিতে হইল।

গোপালবাবু শিবুকে সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া পরিচয় দিতেই গমগমে গরম আসরখানায় কে যেন জল ঢালিয়া দিল। বরযাত্রী সকলেরই মুখ কাল হইয়া গেল। বরকর্তা উঠিয়া আসিয়া জোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখব বে-ই মশাই, তাই ছদ্মবেশ প্র্যাক্‌টিস করছি।

তুচ্ছ রসিকতা, কিন্তু ইহাতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর কিন্তু দুরন্ত বরযাত্রীর দল সুবোধ বালক হইয়া গেল—যাহা পাইল তাহাই খাইল—যাহা অনুরোধ করা হইল তাহাই রাখিল।

বাড়িতে আসিয়া একথা শিবনাথ প্রকাশ করিল না—গৌরীর উষ্মা আশঙ্কা করিয়া।

সেদিন সে পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানা সাপ্তাহিকের একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। প্রবন্ধটা গল্প সাহিত্যের উপরে লেখা—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরী ঘরে ঢুকিয়া একখানা খোলা চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শিবনাথ দেখিল, দিদি লিখিয়াছেন চিঠিখানা। সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গৌরীকে তিরস্কার করিয়াছেন —তুমি নিশ্চয়ই শিবনাথের সেবা যত্নে মনোযোগী নও। রত্ন পাইয়া তুই চিনিলি না পোড়ারমুখী!

শিবনাথ মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বলিনি তোমাকে আমি।

অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া গৌরী কহিল—তুমি চেঞ্জে যাবে কি না বল? নইলে –কথা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

শিবু বলিল—আবেগ ভাল নয় গৌরী, শোন, আমার কথা শোন!

গৌরী চোখ মুছিল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। সে বলিল —লোকে তোমায় চাকর ভেবে অপমান করে, কতজনে কত কথা বলে। ও বাড়ির হরির বৌ সেদিন কি বল্লে জান, বল্লে—দিদি, বড়ঠাকুর কি নেশা টেশা করেন যে এমন পাক দেওয়া—

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শিবু হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার মিথ্যে দুঃখ গৌরী!

গৌরী বলিল—না, মিথ্যে নয়। নিজের স্বামী সন্তান কুৎসিৎ হলেও কেউ সে কথা বল্লে বড় দুঃখ হয়। বুলুর কথা কি মনে নেই তোমার?

শিবু চমকিয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে।

গৌরী বলিল—বুলুর কথা ত তোমার ভোলবার নয়!

বুলু শিবনাথের মৃতা কন্যা। মেয়েটি শিবনাথের বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু সে ছিল কাল, তাহার উপর চোখ দুটি ছিল ছোট ও ট্যারা।

গৌরী বলিল—মনে পড়ে তোমার গাঙ্গুলীবাবুদের ঠাকুরবাড়ি থেকে যেদিন সে কাঁদতে, কাঁদতে—

ঝর ঝর করিয়া গৌরী নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথের মনশ্চক্ষের উপর ছবিটি ভাসিয়া উঠিল।

শিবনাথ বসিয়া জল খাইতেছিল সেদিন। অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে

চার বছরের মেয়ে বুলু আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে লইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল মা, কে মারলে তোমাকে ?

বুলু উত্তর দিতে পারিল না—চোখের জলে বুকের দুঃখ তখনও তাহার নিঃশেষিত হয় নাই। উত্তর দিল গঙ্গা, শিবনাথের বড় মেয়ে। সে বলিল—ওই ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিলাম আমরা পূজো দেখতে। তাই ওদের গিন্নী বল্লে, এই কাদের ছেলে তুই ? সরে যা ! তা আমি বল্লাম—ও আমার বোন। তাই ওরা কি বল্লে জান বাবা—বল্লে, শিবুর মেয়ে ! ওমা কি কুচ্ছিৎ হয়েছে এটা, চোখ দুটো আবার দেখ ! শিবু বিয়ে দেবে কি করে গা ! বুলু ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। রাস্তা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

শিবনাথের মনে পড়িল, সেদিন সে বলিয়াছিল—মিথ্যে কথা মা, ওরা মিথ্যে কথা বলেছে ; এই দেখ তুমি—আমার চেয়ে কত সুন্দর তুমি !

বুলু সান্ত্বনা পাইলেও শিবনাথের কথা বিশ্বাস করে নাই, সে বলিয়াছিল—বাবা, তুমি কাল আর আমি কাল ! ওরা সব সুন্দর !

গৌরী তখন বলিতেছিল—সে আঘাত আমি জীবনে ভুলব না। তুমিও ত সেদিন কেঁদেছিল।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভুলি নি গৌরী !

গৌরী বলিল—তুমি হাস, কিন্তু আমার বুকে তেমনি আঘাত লাগে ! তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশী তৃপ্তি।

শিবনাথ গৌরীর হাতখানি টানিয়া আপনার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—এখানটা বড় ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।

গৌরী নীরবে স্বামীর ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আরামে শিবনাথের চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথাটি হেলাইয়া সে গৌরীর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—আজ থেকে তোমার হাতেই সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম গৌরী। যা করবার তুমি কর।

চোখে জল মুখে হাসি মাখিয়া গৌরী বলিল—তা হ'লে আসছে সপ্তাহেই [illegible]

[illegible] চোখ [illegible]লিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া শিবু বলিল—কিন্তু আমি সুন্দর [illegible] কে দেখে তোমার মনে কি বেশী আনন্দ হবে ?

গৌরী আরক্তি[illegible]য়া উঠিল, বলিল—হবে, এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হবে।